আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

২০০১

৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলকাতা-৭০০ ০২৬

আশুতোষ কলেজ পত্রিকা

বর্ষ ঃ ২০০১

প্রধান উপদেষ্টা — অধ্যাপক ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

উপদেষ্টা মণ্ডলী — শ্রী অংশুতোষ খাঁ, শ্রীমতী রাইকমল দাশগুপ্ত,
শ্রী অমল চক্রবর্ত্তী

পত্রিকা সম্পাদক — সুজয় কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

বিশেষ সহযোগী সম্পাদক
(ইংরাজী বিভাগ) — ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলী — শুচিস্মিতা রায়, অনুমিত্রা ঘোষ দস্তিদার, শমীক বিন্দু,
বিশ্বক সেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজীব ভট্টাচার্য

কর্মাধক্ষ্য — অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

বিশেষ কৃতজ্ঞতা — শ্রী রাহুল কানুনগো
শ্রী কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী সজল বসাক
শ্রী রানা সাহা
শ্রী শুভাশিষ কুমার দে
শ্রী দীপক দত্ত
ও
সকল ছাত্র-ছাত্রী

প্রচ্ছদ — শ্রী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী

প্রকাশক — অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত চৌধুরী

মুদ্রক — কর্লেট, কলকাতা-২৬

আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

বর্ষ ঃ ২০০০-২০০১

সভাপতি ঃ
অধ্যাপক শ্রী অংশুতোষ খাঁ

সহ সভাপতি ঃ
রাহুল কানুনগো

সাধারণ সম্পাদকঃ
অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়

সহ সাধারণ সম্পাদক ঃ
শুভাশিস কুমার দে প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ
শুচিস্মিতা রায় কৌশিক চক্রবর্ত্তী

সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক ঃ
সুমন বসু

যুগ্ম ক্রীড়া সম্পাদক ঃ
নীলাদ্রী প্রসাদ দাসগুপ্ত দীপঙ্কর সাহা

সহ-ক্রীড়া সম্পাদক ঃ
সুশীল কুমার সিং দীপ্তেন্দু মুখুটি

পত্রিকা সম্পাদক ঃ
সুজয় কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

গ্রন্থাগার সম্পাদক ঃ
দেবাংশু সেন

কমনরুম সম্পাদক ঃ
অনির্বান ভৌমিক

ক্যান্টিন সম্পাদক ঃ
কৌশিক দে

যুগ্ম ছাত্রাবাস সম্পাদক ঃ
অর্ণব কর দেবমাল্য দাশগুপ্ত

অন্যান্য সদস্য ঃ
রানা সাহা, সঞ্জীব অধিকারী, কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়, সজল বসাক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

কিসের ভুলে রেখে গেলে আমার বুকে
ব্যথার বাঁশিখানি

কলেজের প্রাক্তন ছাত্র বিশিষ্ট সাহিত্যিক
শ্রী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াণে
আমরা গভীর মর্মাহত, শোকস্তব্ধ

তোমাদের ভুলিনি

কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ঃ
সৌরভ বসু, সর্বজিৎ মজুমদার, চন্দ্রানী হালদার
এবং শিক্ষাকর্মী অরুণ ঘোষ

তোমরা ঘুমাও আমরা তো আছি লাখ অযুত

সারা পৃথিবীতে যারা সাম্য, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে শহীদ হয়েছেন
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে গিয়ে যারা শহীদ হয়েছেন

প্রকাশকের কথা

সময়

সাল ১৯৬৫ ; সম্ভবত ৯ই জুলাই। এক কিশোর এই আশুতোষ কলেজের বিশাল ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খানিকটা অসহায়ই মনে করেছিল। কিছুটা ভয়, কিছুটা চিন্তা, কিছুটা আশা সব মিলিয়ে মিশিয়ে এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে কলেজের হলে প্রবেশ করলো সে।

হলে প্রথম টেবিলে বসে আছেন এক সৌম্যদর্শন অধ্যাপক, তাঁর হাতে মার্কশিটটা তুলে দিতেই স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—

'কোন সাবজেক্টে অনার্স পড়বে?

উত্তর দিলাম— 'ফিজিক্সে'। এটাই মনস্থ করেছিলাম।

উনি বললেন—। তুমি কেমিস্ট্রিতে অনার্স পড়ো।'

অদ্ভুত যাদু ছিল ওনার কথায়। রাজি হয়ে গেলাম। অধ্যাপকের নাম প্রয়াত সুনীল সিদ্ধান্ত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, জানি তুমি স্কলারশিপ পাবে তবুও তোমাকে প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। ওনার সঙ্গে অধ্যক্ষ খগেন সেনের কাছে গেলাম, তিনি মার্কশিট দেখেই, মাত্র পয়ষট্টি টাকায় ভর্তি করে নিলেন।

শুরু হল আশুতোষ কলেজে ছাত্র জীবন। এখানে ছাত্রশিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক, লেখাপড়ার পরিবেশ ইত্যাদি অনেক কথাই আজ মনে পড়ে আর ভাবি আজকের প্রজন্মকে আমরা কতটুকুইবা দিতে পারছি। শুধু ক্লাসরুম নয়, ক্লাশরুমের বাইরেও ছাত্রশিক্ষকদের মধ্যে একটা সহজ সরল মধুর সম্পর্ক, যেখানে পড়াশোনার আলোচনা থেকে শুরু করে ক্রিকেট ফুটবল কিছুই বাদ যায় না। মনে পড়ে অধ্যাপক সুবীর বসুরায়, অধ্যাপক সমর বসু এঁদের সাহচর্যের কথা, যা যতটা অনুভব করেছি ঠিক ততটাই ব্যক্ত করতে অক্ষম। এমনকি এদের স্নেহভালোবাসার কোনো ঘাটতি দেখিনি কলেজ জীবন ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পৌঁছেও। আর গবেষণার সময় এনাদের পরামর্শ জীবনের স্বপ্নকে সার্থক হতে সাহায্য করেছে। এরপর একটা ঘটনা না বললে বোধহয় ঠিক হবে না। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক সুনীল সিদ্ধান্ত আমাকে ডেকে পাঠান। কারণ তখন আশুতোষ কলেজে এক অলিখিত নিয়মই ছিল কলেজের কৃতী ছাত্রদের পরবর্তীকালে তার কলেজেই অধ্যাপনার সুযোগ দেওয়া আর সেহেতুই আমার তলব। স্যারের কথানুযায়ী রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনার জন্য আবেদন করলাম, শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ইন্টারভিউ দিলাম, সফল হলাম। তবে উনি সোজাসুজি বললেন— 'দেখো, তোমাকে নিতে আমি ইচ্ছুক কিন্তু যদি কলেজের তোমার থেকে কোনো সিনিয়র কৃতী ছাত্র আবেদন করে তবে এবার তোমার হবে না। একটু দমে গেলাম কিন্তু সত্যকে এত সহজভাবে বলার প্রয়োজনীয়তা শিখলাম বড় মাপের মানুষটির কাছ থেকে।

যাই হোক কিছুদিনের মধ্যেই DPI-এর প্যানেলভুক্ত হয়ে ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হলাম। আশ্চর্য্যের ব্যাপার কয়েকদিনের মধ্যেই অধ্যাপক সুনীল সিদ্ধান্ত আবার আমাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন শ্রী রমাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর সঙ্গে দেখা করতে কারণ আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনার কাজে উনি আমাকে নিতে ইচ্ছুক। কিন্তু নানা কারণবশত নিজেই আর কলেজ পরিবর্তনের কথা ভাবিনি।

২০০০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর। কলেজ সার্ভিস কমিশন দ্বারা মনোনীত হয়ে এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগাদান করলাম। মনে হল জীবনে কোনো কিছুই হারায় না। প্রথমদিনে শ্রদ্ধেয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক সম্ভাষণ, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের উষ্ণ অভিনন্দন, অসংখ্য ফুলের তোড়া আর অভিনন্দিত কার্ড আমাকে মুগ্ধ করলো, অভিভূত করলো, বিস্ময়ে, আনন্দে অনুভব করলাম আশুতোষ কলেজের ঐতিহ্য, লাভ করলাম সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার প্রেরণা। আর এরই সঙ্গে শিক্ষাকর্মীদের কথা আলাদাকরে বলার অপেক্ষা রাখে না। কলেজের বিস্তর কাজে প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তে পাচ্ছি তাদের সহযোগিতা, আন্তরিকতা। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় অধ্যক্ষ হিসেবে কলেজে যোগদান করে আমি আমার দু তিনজন শিক্ষকের সংস্পর্শে আরোও ঘনিষ্টভাবে এলাম। দেখা হল সেই সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী অঙ্কের অধ্যাপক শ্রী সুভাষ নন্দীর সঙ্গে। যাঁর এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নি। একই চেহারা, একই মনের মানুষ যন্ত্রের মতো নিঃশব্দে একটার পর একটা ক্লাশ নিয়ে চলেছেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রী অমৃতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি যখন আশুতোষ কলেজের ছাত্র, উনি তখন এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তরুণ অধ্যাপক। সে হিসেবে আমার শিক্ষক, এঁদের পরামর্শ, আমার কর্মজীবনের পাথেয়, এবার আসি ছাত্রছাত্রীদের কথায়, এদের রেজালট, শিষ্টাচার, ভব্যতা, অসংখ্য গুণ আমাকে আনন্দ দেয়। আমি আজও বিশ্বাস করি ছাত্রছাত্রী মাত্রেই সরল অনুভূতিপ্রবণ। এদের সঠিক পথে চালনা করা বা পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই।

আশুতোষ কলেজ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম কলেজ। কাজেই এই কলেজের অম্লান গৌরব বজায় রাখা এবং শ্রীবৃদ্ধি করার দায়িত্ব কলেজের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষের প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে। এ বছর আশুতোষ কলেজ পেয়েছে গর্ব করার মতো, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত তিনটি অনার্স কোর্স— সাইকোলজি অনার্স, কমপিউটার সায়েন্স অনার্স এবং বি.বি.এ (অনার্স), কিছু বিষয়ে স্নাতকোত্তর খোলার কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। লাইব্রেরী কমপিউটারাইজড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বেশকিছু বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরিগুলো সংস্কার করা হয়েছে, অন্যগুলোও করা হবে। আর সবশেষে বললেও সবচেয়ে প্রথমে সবার চোখে পড়ছে আশুতোষ কলেজ ভবনটির চাকচিক্যময় চেহারা। কলেজের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে সংস্কার চলছে দ্রুতগতিতে। এই সবই সম্ভবের কারণ সকলের সমবেত প্রচেষ্টা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং শিক্ষা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনা। আজ যখন শিক্ষায় গৈরিকিকরণ, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়নের প্রচেষ্টা চলছে, ছাত্রদের মূল সমস্যা থেকে সরিয়ে তাদের চিন্তাভাবনাকে অপসংস্কৃতির জোয়ারে ভাসিয়ে দেবার চক্রান্ত চলছে, তখন তার বিরুদ্ধে সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র ঐক্যবদ্ধ। একে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

এবার অধ্যক্ষ হিসেবে আমার প্রতিশ্রুতি, আশুতোষ কলেজ নিয়ে অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী দিনে সকলের সহযোগিতায় এই প্রচেষ্টা সফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

সবশেষে। এই কলেজের যাদের কাছে একদিন পড়েছি, তাদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই, তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম জানাই সেই সমস্ত অধ্যাপকদের, যারা অবসর জীবনযাপনে করছেন, শুভেচ্ছা আর প্রীতি রইলো সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতি।

ডঃ দেবব্রত চৌধুরী
অধ্যক্ষ, আশুতোষ কলেজ

সভাপতির কলমে

পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগণ্য কলেজগুলির মধ্যে আশুতোষ কলেজের বিশেষ স্থান রয়েছে। প্রায় একুশটি বিষয়ে স্নাতকস্তরে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা শুধু নয়, শিক্ষান্তে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে (W.B.C.S., I.A.S., NET, SLET) প্রভৃতি পরীক্ষাগুলির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে এই মহাবিদ্যালয়ে। এমন ধরণের ঐতিহ্যশালী কলেজের মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে ছাত্রসংসদের ভূমিকা তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন ভারতবর্ষে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পুষ্ট করার প্রয়োগে রাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন সমর্থন পরিলক্ষিত হচ্ছে, তখন সুস্থ সামাজিক মূল্যবোধ ও ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুখের কথা, আশুতোষ কলেজ ছাত্রসংসদ এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছে। সেই সাথে শিক্ষার অঙ্গনে নৈরাজ্যের পরিবেশ যাতে না ফিরে আসে সেই ব্যাপারেও ছাত্র সংসদ তার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। কলেজে আন্তঃ শ্রেণী সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলি সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। নবীনবরণ উৎসব ও বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজনে ছাত্ররা পরিশীলিত মননের পরিচয় রেখেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছে এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে ছাত্রছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক সচেতনতার পরিচয় মেলে। আগামী দিনেও এই গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষুন্ন থাকবে, এমতের প্রত্যাশা তাই অসংগত নয়।

অংশুতোষ খাঁ
সভাপতি
আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

আশুতোষ কলেজে প্রথম দিনটা কেটেছিল খুব ভয়ে ভয়ে। কারন কলেজ মানেই র‍্যাগিং, রাজনীতি, স্ট্রাইক। কিন্তু পরে আমার এই ভুল ধারনা ভেঙে যায়। ভালোবাসতে শুরু করি কলেজটাকে। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে কলেজ রাজনীতিতে নিজেকে জড়িয়ে ফেললাম। সেকেন্ড ইয়ারে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জিতে সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হলাম এবং থার্ড ইয়ারে সাধারণ সম্পাদক। সম্পাদক হিসাবে কার্যকালের মধ্যে প্রতি বছরের মতই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নবীনবরণ অনুষ্ঠান, কমনরুম প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কাজগুলো সঠিকভাবে সকলে মিলে সম্পন্ন করতে পেরেছি। সারা বছর ধরে কলেজের টিমগুলো বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিষ্ঠানের ৮৫তম প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগদান করে আমরা আমাদের ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা ও সংস্কৃতির চিরন্তন পীঠস্থান। আশুতোষ কলেজ তারই পরিচয় বহন করে। সারা পশ্চিমবাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকোজ্জ্বল যাত্রাপথে আমাদের প্রতিষ্ঠান শিক্ষা-সংস্কৃতির সমুজ্জ্বল প্রদীপ হাতে সবার আগে এগিয়ে চলেছে। প্রতি বছরের মতন এবারও ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে দেওয়াল পত্রিকা। এবছর থেকে নতুন তিনটি বিষয় অনার্স চালু হল। বর্তমানে আমাদের কলেজ পশ্চিমবাংলার বুকে সবচেয়ে বেশী অনার্স প্রাপ্ত কলেজ।

এই কলেজে কখন যে তিনটি বছর কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না। গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ফেললাম। এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পরলাম যখন বুঝলাম ছেড়ে চলে যেতে হবে কলেজটাকে। মনের মধ্যে একটা গানের লাইন উঁকি দিয়ে গেল "দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না", কিন্তু স্মৃতি হিসাবে আমার যাকিছু রইল তা অনেক অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সারাজীবন। সামনেই কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন। জানি কোন নবীন উঠে এসে নেবে আমার জায়গা। কলেজকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে কয়েক ধাপ। এ বিশ্বাস আমার আছে। আশুতোষ কলেজের ছাত্র হিসেবে যতটা গর্ববোধ করি, ততটাই আমার বিশ্বাস নবীনদের প্রতি। আশা রাখি আগামী দিনের নবীন বন্ধুরা সুস্থ চেতনার বহিঃ প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করবে। বিগত দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকল ছাত্র-ছাত্রীকে জানাই আমার ভালোবাসা এবং অধ্যক্ষ, সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জানাই আমার শ্রদ্ধা।

অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায়
(সাধারণ সম্পাদক)
আশুতোষ কলেজ ছাত্র সংসদ

সম্পাদকের কলমে

আজ সম্পাদকীয় লিখতে বসে একটি কথাই শুধু বার বার মনে পড়ছে যে কলেজ ম্যাগাজিনে আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি সেবছর আমার লেখাই স্থান পায়নি। খুব একটা হয়ত কেউ-কেটা নই কিন্তু সেদিনের আশাটা ছিল সর্বাত্মক। একথাটা দিয়ে সম্পাদকীয় শুরু করলাম এইজন্য যে এবারেও কলেজে অনেক নবীন ছাত্র-ছাত্রী লেখা দিয়েছে যাদের লেখা ছাপা গেল না শুরুতেই সেই কথাটা বলতে চাই তাদের বলি দুঃখ করো না এ বিষয়ে জগতে দুঃখ করার জন্য তো অনেক কিছু আছে। বাতাশ কাঁদছে আকাশ কাঁদছে সবচেয়ে বড় কথা পৃথিবী কাঁদছেন কবির ভাষায়

কি গভীর দুঃখে মগ্ন সমস্ত পৃথিবী
সমস্ত আকাশ।
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্য ক্ষেত্রে জাহ্নবীর মূলে
একখানী রৌদ্র পীতহিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া...

বসুন্ধরার সেই রূপে কাঁদবার ছায়া। এই যে চারিদিকে যুদ্ধ নৃশংসতা মৌলবাদ যুগ যুগধরে দুঃখ জমা হয়ে চলেছে একদিক দিয়ে মৌলবাদ এটিলার হুঙ্কার তোরমানের স্পর্ধা মৌলবাদ তালিবানের আক্রমণ, ফুটবল মাঠে নারীদের সকলের সামনে গুলি করে মারা, বামিয়ান বুদ্ধের শান্ত স্থবিরে মারের আক্রমণ। মৌলবাদ কি শুধুই বাইরে, আমাদের দেশে নেই? মিশনারি গ্রাহাম ষ্টেইন্‌স ও তার পুত্রদের পুরিয়ে মারা, ধর্ষন, ধর্মান্তর করণ এবং সবচেয়ে খারাপ ভারতের কালাইতিহাস ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ বাবরি ধ্বংসের দিন। এরা দিনেদিনে কোন দেশে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। যে দেশে বাল্য বিবাহ হবে, বহু বিবাহ হবে, সতীদাহ করে তার মন্দিরে পূজা হবে? তোমরাই বল এমন ভারতই কি আমরা চেয়েছি? সবচেয়ে জঘন্য আক্রমণ ফ্যাসিবাদী জোটের তা হল তারা মধ্যশিক্ষা পর্বদগুলিকে বলেছে ইতিহাস ভূগোল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত বিষয় মধ্যশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে রাখার আর দরকার নেই। মনে পড়ছে হীরক রাজার ঐ কথাটা 'এরা যত বেশী পড়ে তত বেশী জানে তত কম মানে'।

এবার মনে হয় রুখে দাঁড়াবার দিন এল সকল উঠতে হবে শুরুতেই কলমের সঙ্গীন ফলা ঝলসে নিয়ে, কাস্তে নিয়ে সংগ্রামের লালপতাকা হাতে। চারদিক থেকে ডাক উঠেছে ধ্বংস হোক সন্ত্রাসবাদ তার সাথে বন্ধ হোক সাম্রাজ্যবাদের হানাদারি, যাতে নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়, এর বিরুদ্ধে পথে নামতে হবে সকলকে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে শুরু হোক যুদ্ধ। কবির কথাতেই শেষকরি

দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছি বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

সুজয় কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
(সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে)

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
কবিতা সংকলন		
আমার মেয়ের জন্মদিনে	অধ্যাপক অমল চক্রবর্ত্তী	১
'চে'র জন্য	ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়	
পরিচয়	অনিন্দ্য ঘোষ	
ও চাঁদ	অনুমিত্রা ঘোষ দস্তিদার	
সৌরভ	দেবনারায়ণ ভট্টাচার্য	২
পুনরাবৃত্তি	সূর্যপ্রতাপ চন্দ্র	
আমার স্বপ্ন	অতনু দে	৩
তোমার জন্য	অরুণ দাস	
একান্তে একদিন	তানিয়া দে	
আহত শৈশব	অনুজ গাঙ্গুলী	৪
ভিতর দেখেনা কোন লোক	....	
আত্মান্বেষনের পথে	উজ্জ্বল সিকদার	৫
ছেলেবেলা	কৌস্তভ চ্যাটার্জী	
অতীতকে ভুলে যাও	অরিন্দম মন্ডল	৬
আদর্শ বিকল্প জীবনের সন্ধানে	সুদীপ্ত দাশগুপ্ত	৭
বাস্তবে প্রেম	সুমন কুন্ডু	
একদিকে তুমি অন্যদিকে	সুরাইয়া সুলতানা	৮
শুধু তুমিই	রনজীব ঘোষ	
हम अर हमारा देश	प्रसून झा	
একটুকরো স্বর্গ	অভিষেক গুপ্ত	৯
কোথায় অর্জুন	দীপ্তিমান ভান্ডারী	
বন্দী	শুচিস্মিতা রায়	
এবা	শ্রাবন্তী পাল	১০
বেঁচে থাকার সহজ উপায়	পায়েল সেনগুপ্ত	
বসন্ত বিলাপ	অভিজিৎ ধর	১১
জীবনের অঙ্গ	ইন্দ্রনীল মিত্র	
র‍্যাগিং	সোমদত্তা মুখার্জী	১২

		পৃষ্ঠা
প্রবন্ধ/গল্প		
পরে কোন দিন	ইমরান আমেদ	১৩
ক্রীড়াঙ্গন এক প্রমোদ তরনী	অর্ক রাজ পন্ডিত	১৪
সিগারেট ধুমপান ও তার প্রভাব	তরুন মান্না	১৬
রূপকথা বনাম রূপোলী পর্দা	অধ্যাপিকা চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত	১৭
রাজস্থানের দুর্গে প্রাসাদে মরুতে কয়েকদিন	দেবলীনা পাল	২০
প্রকৃতির বিচিত্র প্রাণী	নির্মল দে	২১
বিচার	রাকেশ মুখোপাধ্যায়	২২
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব সিনেমা	সৌভিক গোস্বামী	২৫
টুকরো হাসি	জয়ন্ত সাহা	২৬
বন্ধু	দীপ্তা গোস্বামী	২৭
লালডুরে শাড়ি	মৌসুমী দেবনাথ	২৮
অভাগিনী	অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
Poems		
Mother	Nancy Sarkar	32
Obliteration	Rudradip Gupta	
If only I was granted a wish	Soumarea Bhattacharya	
Ulysses	Arindam Mazumdar	33
Drug Addiction	Chinmay Mallick	
Articles		
Food for thought	Trishul Pani Mukherjee	34
Agatha Cristie	Bishwaksen Bandyopadhyay	35
Rode of women in India	Sourav Nandy	36
Debate forum	Satabdi Samtani	37
The Exuberance of Inner Soul	Gaurav Roy	38
New Horizon of Vaccines	Abhirup Mukhopadhyay	39

আমার মেয়ের জন্মদিনে

অমল চক্রবর্তী
অধ্যাপক

কিছুই তোকে দিই নি, বৃক্ষ
লতিয়ে তবু উঠিস
কেবল ভারি যত্ন, শুধু সতর্ক শাসন
কেবল কাঁচের বাক্স তাতে যাদু
কেবলি ফুঁ কেবলি ফুঁ শান্ত জলতাড়া
লতিয়ে তবু উঠিস

দিই নি তোকে পুকুর, মাঠ, রঙিন মার্বেল
দিই নি ফড়িং, কুকুর ছানা, আমবাগানের ঝড়
দিয়েছি যা ঘরের ভেতর হরিণ বাড়ির মাটি
দিয়েছি চলা, ছবি, গান ঘরের মাপসই
দিয়েছি এক মস্ত দেশ, রূপকথার ছাই

স্বপ্নহীন রক্তহীন ভীষণ শাদা রক্ষক
আমাকে ওরা গড়েছে এই, দিয়েছে এই
তোকেও দিই তাই
ধানদুর্বা মাথায় দিয়ে মন্ত্র পড়ি, বৃক্ষ
অসম্ভব অগ্নি, তবু অরণি হ তুই

আমার থাক্ শ্বেতাস্থি, আমার থাক্ তক্ষক

ও চাঁদ

অনুমিত্রা ঘোষ দস্তিদার
দ্বিতীয় বর্ষ (কলা)

নীল আকাশে
ধূসর ঐ চাঁদের হাতছানি।
আমি
হাঁটু মুড়ে বসে
লাল কাঁচ দিয়ে দেখি।

'চে'র জন্য'

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশিত, নিষিদ্ধ ইস্তেহার,
চেতনার অন্ধকারে বলিভিয়ার রুক্ষ প্রান্তরে
ইনকাদের ভালোবাসার শরীরি গন্ধ....
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে
মহা সাগরের নোনা হাওয়া।
বিষিয়ে দিয়েছিল ...
আলতামিরার অনাদি আদিমতায়
মিছিলে কণ্ঠ ....
তোমার, আমার ....
হাজার কোটি বছরের ধ্বংসস্তূপ
থেকে
সংগ্রামী 'চে'রা আওয়াজ তোলে
ধ্বংস করো ....
ছিড়ে ফেলো পৃথিবীর ....
কুমারীত্ব।।

পরিচয়

অনিন্দ্য ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ (কলা)

আমায় একটা ছবি এঁকে দেবে
দৌড়তে দৌড়তে এসে— বলেছিল সে।
আমি তার ছবিটা দিয়েছিলাম এঁকে
হাসতে হাসতে।।
আমায় একটা কবিতা লিখে দেবে—
আসতে আসতে বলেছিল সে।
আমি তার কবিতাটা দিয়েছিলাম লিখে
আস্তে আস্তে।।
স্বপ্ন সোপান-এগিয়ে চলল—
ভাসতে ভাসতে
মাঝ সমুদ্রে উঠল তুফান—
আমি পড়লাম তার প্রেমে
আস্তে আস্তে।।

সৌরভ

দেবনারায়ণ ভট্টাচার্য
দ্বিতীয় বর্ষ (বি.এ.)

হৃদয়ের বন্ধু তুমি
ছিলে মোদের কাছে
চলে গেছো অনেক দূরে
আমাদের সকলকে ছেড়ে।
বেদনাতে রয়েছি মোরা
তোমার কথা ভেবে
তুমি কি ফিরবে না আর
আমাদের সকলের মাঝে।
থাকতে তুমি আনন্দতে
আমাদের সকলকে নিয়ে।
কখনও ভেবেছি কি
তুমি চলে যাবে?
তোমার অনুপস্থিতিতে
বড় খারাপ লাগে।
তুমি কি আসবে ফিরে
আমাদের মাঝে,
এই জিজ্ঞাসাটাই রাখি আজ
তাঁর কাছে।
আজ দিনের পর
দিন চলে যায়
ভুলতে থাকে সবাই
আমি কি ভুলবো কখনও
তোমার কথা।
আজ তুমি পরলোকে।
এটাও কি সম্ভব
এটা যে তার খুশি
সকলের মানা অসম্ভব।
বন্ধু সকল মিলে আজ
করি এই মিনতি
তোমার আত্মা যেন
পায় চির শান্তি।

পুনরাবৃত্তি

সূর্যপ্রতাপ চন্দ্র
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

আমি মৃতের কবর খুঁড়ে উঠে এসেছি।

আমি যুদ্ধ করেছিলাম জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সৈন্য হয়ে। আমার শব তৈরী হয়েছিল পারমাণবিক বোমায় হিরোশিমা নগরে। তারওপরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জেরুজালেমের কোন এক কবরে।

আর আজ আমার কনিষ্ঠরা আমাকে ডেকেছে; শত-শত সন্তানহারা মা— ইরাকের মরু-বক্ষ থেকে তারা এসে দাঁড়িয়েছে টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিসের মোহনায়।

আজ আবার দাঁড়িয়েছি যুদ্ধের পতাকা নিয়ে আফগান সীমান্তে ; তালিবানদের বন্ধু হয়ে নয় তাদের শত্রু হয়ে। নাজিবুল্লার ঠান্ডাবুকে হাত রেখে আমি শপথ নিয়েছি যারা যুগস্লাভিয়া মায়ের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার সন্তানকে তাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার।

আমি কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়ে কাঁধে আমার রক্তিম পতাকা, যে পতাকা রাশিয়ার বুক থেকে নেমেগেছিল তাকে মস্কোর মাটিতে আবার আমি পুঁতবই।

আমার নিদ্রা ভেঙেছে আফগানের মন্বন্তরে। বুভুক্ষায় মৃত কঙ্কালগুলো আমাকে দাঁড়করিয়েছে পৃথিবীর সমস্ত রাজপথে।

তাই হাজারো জনতার মাঝে মাঝে কেবল বন্দুক নিয়ে নয় আমি দাঁড়িয়েছি মানবতার জেহাদ ঘোষণা করতে।

আমার স্বপ্ন

অতনু দে
প্রথম বর্ষ (বি.এস.সি.)

তীব্র যন্ত্রণা, লাঞ্ছনার নির্মম ক্ষত ক্রমশঃ ভরছে
আরোগ্যের পথে আবেগহীনতার ছোঁয়া ;
আমি বাড়ছি—

মনের আয়তনও এখন অনেকটা—
নির্বিকার সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী ;
তবুও আমি বাড়ছি—

বর্ষার কর্দমাক্ত জমিতে নিঃশব্দে বেঁচে থেকে
আজ বসন্তে আমার স্বপ্ন—
শাখা প্রশাখা ও নবপল্লবে সঞ্চারিত।

একটা চিনেবাদামের খোলার ভিতর থেকে
সশব্দে বেরিয়ে আসছে!
আমার স্বপ্ন—

এক নতুন পথের দিশারী, এক আবেগময়
স্বপ্ন, আমার প্রাণ।
আমার স্বপ্ন।

একান্তে একদিন

তানিয়া দে
প্রথম বর্ষ (বি.এস.সি.)

আবার এতদিন পরে তোমার ঘরে আমি একা
চোখ চলে যায় ধুলো পড়া জানালা দিয়ে
সেই মাধবীলতার দিকে,

আজও সে সবুজ পাতা, সাদা ফুল আছে
তোমার সেই সখের বাক্সটা খুললে
বার্মিজ চুরুটের গন্ধটা আজও নাকে এসে লাগে
তোমার বইগুলো ধুলো পড়া, পোকাকাটা
কিন্তু আজও তারা আছে
আর আছে আমার না-বলা অনেক কথা
তারা এখনো বাসা বেঁধে আছে এখানে
থাকবে চিরটাকাল আমার তোমার অজান্তে।

তোমার জন্য

অরুন দাস
প্রথম বর্ষ (বি.এস.সি.)

যদি বলো, তোমার জন্য রক্ত ঝরিয়ে—
ঐ গোলাপটা ছিড়ে আনতে পারি।
পৃথিবীর সবটুকু সুন্দর—
তোমায় দিতে পারি।

যদিবলো, তোমার জন্য সাগর থেকে
দুস্প্রাপ্য মুক্তা কুড়োতে পারি।
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কারে—
সাজাতে পারি তোমায়।
যদি বলো, তোমার জন্য চাঁদটাকে—
আনতে পারি পৃথিবীতে।
জোছনার স্বর্গ গড়তে পারি—
এই পৃথিবীর মাটিতে।

যদি বলো, তোমার জন্য—
অশ্রুতপূর্ব-সব উপমা দিয়ে,
লিখতে পারি জীবনের—
সেরা কবিতাটা।

যদি বলো, জীবন দিতে—
তাওপারি তোমার জন্য,
তবুওতো থেকে যাবো—
শুধু তোমারই।

An eye for an eye
makes the world blind
STOP WAR

'আহত শৈশব'

অনুজ গাঙ্গুলী
শিক্ষাকর্মী, আশুতোষ কলেজ, কলকাতা

"পূজনীয় কাকু, আজ ছুটি।
তোমাকে এখন চিঠি লিখছি।
তুমি বলো, 'আমি চিঠি লিখি না,'
চিঠি লিখতে খুব ভালোলাগে, জান কাকু—
কিন্তু আমি চিঠি লিখি না কেন?
ভুলে যাই, কেবল ভুলে যাই।
এই যাঃ পেটটা কেমন করে উঠল,
এখন বাথরুমে যেতে হবে,
তারপর এসে লিখছি।"
আমি জানি, আদরের ভাইঝি'র
এবেলা আর চিঠি লেখা হবে না।
এরপর ওর মা—
সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্যে
ওকে সাবান মাখিয়ে
অনেকক্ষণ স্নান করাবে।
তারপর বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্যে
ওকে খাওয়াবার জন্যে কসতর করবে অনেক।
শরীর ঠিক রাখবার জন্যে
ওকে ঘুম পাড়াবে।
বিকেল বেলা ও'কে সাজিয়ে
নিজে সেজে-বিড়েয়ে পড়বে—
টাউনশিপের সেই ছোট্ট পার্কের ধারে
যেখানে অনেক মায়েরা আসবে—
ছেলে-মেয়েদের নিয়ে।
বলবে অনেক কথা—
বানিয়ে বানিয়ে সত্যিতে মিথ্যেতে,
মিথ্যের প্রতিযোগিতায়—
নিজেকে বড়ো বানাবার জন্যে
তার খেসারত দিতে হয়—
মায়েদের ঐ সব ছেলে-মেয়েদের।
সন্ধ্যে হয়ে গেলেই পড়তে বসা
পরের দিন 'টাস্ক' তৈরী করা।
"কাকু আবার চিঠি লিখতে বসলাম।
না— এখন লিখতে পারছি না।
আমার আঁকার Sir এসে গেছেন।
তুমি আমাদের এখানে এসো না কাকু,
আমি তোমাকে অনেক চিঠি লিখে দেখাবো।"
"কাকু, আবার তোমায় লিখছি—
আজ— মনে হয় গানের Sir —
না- না- এসে গেছেন।
তোমাকে চিঠি লেখা হল না।
তুমিতো রাগ করো না, বকো না,
এবার দেখো, বাড়ী গিয়ে
তোমাকে অনেক চিঠি লিখে দেব।"

ভিতর দেখে না কোন লোক

চোখের বাইরে আঁকো চোখ— অন্ধতার দাম্ভিক ঘোষণা,
ঠোঁটের উপরে আঁকো ঠোঁট— স্পষ্ট হোক দমিত বাসনা,
দু'-দশ প্রস্তাবে কীবা হয়— হাতের চামড়া ফ্যালো ছুলে,
মেলে ধরো রূপের পসরা— সাজো বালা, দেখুক সকলে।
মাতৃভাষা ভোলো তাড়াতাড়ি ; পিতৃভাষা কম্পিউটারে
স্বপ্নের দেশে নিয়ে যাবে মাল্টিন্যাশানাল রথে করে।
সেখানে হাজার প্রস্তাবক। সকলেই রাজার কুমার—
সকলেরই এক কান কাটা— কাটা কানে মাকড়ির বাহার।
আহা সে কী মরিমরি রূপ। রূপের পাহাড় সাথে তার।
—এর চেয়ে আরো বেশী সুখ কল্পনায় রয়েছে তোমার?
তবে সাজো সাজো সব ভুলে, লজ্জা-ঘেন্না-ভয় ছুড়ে
ফেলে—
বহিরঙ্গ বিজ্ঞপিত হোক, ভিতর দেখে না কোন লোক।

আত্মান্বেষনের পথে

উজ্জ্বল সিকদার
তৃতীয় বর্ষ (কলা)

তুমি আকাশের বুকে চাঁদ হতে চেয়েছিলে
পারো নি ; তবু ধরনীতলে
ছিল প্রদীপের আলো
হবার প্রয়াস। অনেক-ভালো
হত, যদি তারাও না হতে চেয়ে
জ্বলতে ক্ষীন শিখার মতো হয়ে।
তুমি চেয়েছিলে অরণ্যের বুকে কেতকী হতে
আজ ব্যর্থ মনোরথে
ক্লান্তিকর হতাশায় চারিদিকে ছেয়ে আছে।
নাম না জানা কোন গাছে—
ছিল কতো— আশা,
একমুঠো ফুল ফোটানোর প্রত্যাশা।
আজো কেতকীর সৌরভে এ ভুবনের
পবন সামান্যই মেতে ওঠে। জীবনের
সাধ শুধু কি সুভাষে? অজ্ঞাত ফুল—
তারো তো দু'কূল
ভরিয়ে দেবার মতো সৌন্দর্য আছে ;
এ কি তুচ্ছ বোধ হলো অরণ্যের কাছে?

মরু-মাঝে তুমি আমাদেরই সাথে
জলের পাত্র হাতে
করেছিলে দু'পা পথ চলার সংগ্রাম ;
অবিরাম
প্রয়াসেও সফল হতে পারোনি।
মানুষের যতো গ্লানি—
নিরাশা, সঙ্কটময় অভাবের বিভীষিকা
মাঝে, হতে পারতে মানব-মরুতে মরীচিকা।
প্রতিকূলতার মাঝে যেথা
কেউ নেই, শুধু আকাশ-কুসুম স্বপ্ন-সেথা
পিছিয়ে এসে দেখো তোমার আশে পাশে
অগণিত মানুষ হাত বাড়ায়ে আছে
বুকে তাদের এক বিন্দু জলের মতো আশা
সেখানেই করো কিছু, পড়ো তাদের মুখের ভাষা।
আগামী শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায়
বন্ধুরা সব পৃথিবীময় দুঃখ-দুর্দশায়
তোমার পথ চেয়ে আছে সামান্যেরই প্রত্যাশায়।

অবিশ্বাস-নীচতা-দ্বন্দ্ব-লোলুপতা
মাঝে, তুমি পাথরের মতো পবিত্র দেবতা
হতে চেয়েছিলে ;
ভালোবাসার মন্দির রচনায় ছিলে
মগ্ন। ভগ্ন মনোরথে
সেথা হতে
করেছো প্রস্থান ;
তবু, বন্ধুত্বের কোন এক বাসস্থান
রচনার স্বপ্নও হারিয়ে গেলো
চারিদিকের ঘনো-কালো—
ছায়াছন্ন আকাশে। তাই
আজ দেবাঙ্গনের প্রত্যাশা নাই
গড়ে তোলা চাই
কোন এক গৃহাঙ্গন—
মানুষের মতো মানুষের অঙ্গন।

ছেলেবেলা

কৌস্তভ চ্যাটার্জি

ছায়ায় ঘেরা পথের বাঁকে
চাঁদের আলোর খেলা
পুকুর পারের হাঁসের ডাকে
আমার ছেলেবেলা।।
ঘুরি, লাটাই, বর্শি নিয়ে
অথবা নদীতে দামাল পনা
পড়তে বসলে মাঠের ডাকে
হতেম আনমনা।

অতীতকে ভুলে যাও

শ্রী অরিন্দম মণ্ডল
প্রথম বর্ষ (কলা)

জীবনে অতীত থাকে সবারই,
কারওবা তিক্ততা একটু বেশীই,
তবুও জীবনের এই অভিজ্ঞতা
শেখায় লিখতে জীবন কবিতা।
কিন্তু অতীতকে টেনে এনে
বোঝা কি যায় জীবনের মানে?
অতীতকে পিছনে ফেলে
যদি না যায় কেউ এগিয়ে চলে
শত বাধা, শত কান্নায়—
কেউ তাকাবে না চরম অলসতায়
জীবনে আসে দুঃখ আসে পরাজয়
তাতেই কি ঘনায় মেঘ মনের কোনায়
তাতেই কি বৃষ্টি ঝরে
কারও মনের গভীরে?
কেউ কি বোঝে হায়
কার দুঃখ ঠিক কোথায়?
বিছানো সবুজ গালিচা
কিংবা বাধাহীন রাস্তা
অথবা নিশ্চিন্ত আঙিনা
কোথাও থাকবে না।
কোন মন থাকবে না অপেক্ষায়
কাউকে সান্ত্বনা দেবার আশায়।
কোন মন থাকবে না পিছনে ফিরে
কে কোথায় চোখের জল ফেলছে—
বর্তমানের সুখের স্মৃতি ঘিরে
বর্তমানে দাঁড়িয়ে থেকে
কি হবে শুধু অতীতের ছবি এঁকে?
ভবিষ্যত যাই হোক না কেন
এতো আর অতীত হবে না কোনদিনও,
তবু অতীতকে ফেলে দিয়ে
নিচ্ছে না, কেউ জীবনকে সাজিয়ে
কেন কেউ বুঝছে না—
অতীত পিছনে ফিরে ভুলেও তাকায় না।
সময়ের অবসরে—
কোন কঠিন ব্রত যায় অনন্ত গভীরে।
কেন বোঝে না কেউ
জীবনে যতই আসুক ঢেউ—
ঢেউয়ের পরে আসে শান্ত স্নিগ্ধতা
সেটাই তো জীবনের বাস্তবতা
তুবও মানি অতীত টানে
কষ্ট হয় তাও মন মানে
যদি ভরা গাঙে—
তরী ভাসায় কেউ অন্য মনে
সে তরী ডুববে না—
যদি সঠিক মাঝি থাকে সন্ধানে।
তবুও জীবন নদে—
ঝড় ওঠে, পালও ভাঙে
তখন কি নাবিক জীবন ভয়ে
নৌকা ছেড়ে লোকায় গিয়ে?
শত সহস্র প্রাণ বয়ে নিয়ে
যায় সে চলে সীমানা পেরিয়ে
তার কি চলে
ভয়ে গুটিয়ে থাকলে?
জীবন নদী না হয় উত্তাল আজ,
কাল সে থামবেই তখন হয়ত সাঁঝ—
তখন সেই আঁধার রাতে
দেখতে হবে নতুন পথ আশার প্রাতে।
সময় সময় অতীত স্মৃতির ঝড়ে
মনের মধ্যে শুকনো পাতা ওড়ে
তবু বেঁধোনা অতীতকে
বর্তমানের মায়াডোরে।
বর্তমানকে বেঁধো
ভবিষ্যতের আশায় মুড়ে
দেখা যাবে তবে নতুন প্রভাত
ঝড় থামা, নির্মল কোন ভবিষ্যত
সূর্যোদয়ের ভোরে।

আদর্শ বিকল্প জীবনের সন্ধানে

সুদীপ্ত দাশগুপ্ত
তৃতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান)

'জীবন' ও 'আদর্শ বিকল্প তার' জুটেছিল
একসাথে একমোড়ে দুই ফুটপাথে
রঙিন প্রাণের দল হাত নেড়ে বলেছিল,
"কাছে আয় আপ্‌নার জন;
তোকে রঙ দেবো
ধোঁয়া দেবো
বিকল্প এক পেগ্‌ প্রেম দেব তুলে"
ও পাড়ার দেওয়ালে দেওয়ালে তাই—
তাই এক উত্তপ্ত মৌতাত ছিল।

এ পাড়ায় চোখে চোরা গুস্তখি আর
হাতে হাতে অকাজের কালি
বেআব্রু সময়ের বেশরম হরকৎ মাফ ক'রে
ঘুরে ফেরার অসহায় উপচেষ্টা নিরন্তর
এ পাড়ার দেওয়ালে তাই লেখা আছে
অশিষ্ট গ্রাফিতি আর
বেখাপ্পা সব অলীক ইস্তাহার

কার দিকে ফিরি?
হতবুদ্ধি, নিরুত্তর, মগজে বিশ্বাস
তবু কার দিকে ঘুরেছে বাতাস?
গড্ডলের ভূমিকায় অবতীর্ণ কোন্‌ অবতার?
জরাদীর্ণ মানচিত্রে গন্তব্য ফিকে হ'ল বুঝি
সীমা নেই জীবনে ও বিকল্প জ্যান্ত থাকায়।

বাস্তবে প্রেম

সুমন কুণ্ডু
দ্বিতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান)

যেদিন আমার সাথে প্রথম হয়েছিল দেখা।
সেদিন আমি ছিলাম বড় একা।।

শৈশবের মায়াজাল ঢেকে-ছিল আমায় তখনও,
তাই তোমায় আমার খেলার সাথী ভেবেছি কখনও।
তারপর ধীরে ধীরে কত দিন গেছে বয়ে,
দুজনে প্রাণের বন্ধু হয়েছি গিয়ে।।

যখন শৈশব পেরিয়ে রেখেছি পা কৈশোরে।
তখন প্রথম প্রেমের কলি ফুটেছে অন্তরে।।

তবু পারিনিকো বলতে একে অপরকে।
শুধু রেখেছি চোখের পলক তোমার পলকে।।

মনে মনে এঁকেছি তোমার মুখ।
হৃদয়ে জেগেছে প্রেমেরই স্বর্গসুখ।।

জেগেছে প্রাণে যতই ব্যথা বেদনা।
বেড়েছে হৃদয়ে প্রেমেরই আনাগোনা।।

তারপর বসে ভেবেছি আমি একদিন।
বলতেই হবে যা বলিনি এ্যাদ্দিন।।

মনের কথা মুখে এল।
প্রেমের স্বীকার করা গেল।।

তবু কেন প্রেম এসেও এলনা।
প্রেমিক যে তার প্রেমকে পেলনা।।

প্রেমিকের প্রেম কোথা গেল চলি।
কার ঘর সে, কোন সে গলি।।

ভিনদেশী কোন শিকারীর ফাঁদে।
প্রেমিকের প্রেম একা বসে কাঁদে।।

তবু কিছুই ছিলনা করার।
তাইতো প্রেমিক হলযে ফেরার।।

শুধু এটুকুই কামনা যে তার।
সুখে থাকো তুমি প্রেম যে আমার।

একদিকে তুমি অন্যদিকে ...

সুরাইয়া সুলতানা
দ্বিতীয় বর্ষ (কলা)

আমার একদিকে তুমি অন্যদিকে আমার
গোলাপ গন্ধের মতো ভালোবাসা।
আমার কুয়াশার মতো অভিমান
প্রথম যৌবনের বেদনাময় আকুলতা
লবঙ্গের মতো বেঁধানো দুঃখ আমার
নুড়ি পাথরের মতো জমাট ভুল-ভ্রান্তি
বুদবুদের মত রঙিন অহংকার
আমার লুকিয়ে রাখা হিংস্রতা
উপছে ওঠা কালো রঙের ঘৃণা
মেঘলা দিনের রোদের মতো অস্থির
আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের খেলা।
আমার একদিকে এইসব— আর
আমার অন্যদিকে তুমি।
আমার এইসব কিছুর বিনিময়ে
একবার তুমি আমাকে নাও।

दम और हमारा दम

प्रसून चन्द्र झा
(विज्ञान)

क्यों वांदने की बात सोंचु देम को,
था कल तलक यह सभी के औखोका तारा।
क्यों न सोंचे जोरने की बात हम,
वँटने से रोके क्यो न हम इसे दुवारा।
इस तरह लड़गे एक दुजे का सहारा।
देख कर हमको हसेंगे विश्व वाले,
ताने कसेंगे देखकर लड़ना हमारा।
क्यों न हम मिलबैट कर सारी समस्या हत करे,
फेंक दे बंदूक बम हाथियार सारा।
लगादें सारी शक्ति अपने देश के दिर्माण मे,
हो विश्व में कल देश अपना सअसे न्यारा।

শুধু তুমিই

রনজীব ঘোষ
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

অপেক্ষায় রয়েছি তোমার
রয়েছি অনেক দুরে আশায় বাসা বেঁধে
১লা অক্টোবরের মাঝরাতে দোদুল্যমান
সময় তরির পাটাতনে।
সঙ্গী সিগারেটের রক্তিম আলো,
যেন আমার অস্তিত্বের ঠিকানা, আশার ভরসা।
তুমি, হ্যাঁ তুমিই রয়েছো আজও
আমার মানসপটের নিশ্চুপ অন্তরালে।
কিন্তু তুমি হইতো গভীর রাত্রের
সুকোমল স্বপ্নের নরম আচ্ছাদনে
রয়েছো বিলীন।
তুমি কী অনুভব করেছো
তোমার জীবনে আমার নিঃশব্দ আনাগোনা।
তুমি আমার চাওয়া, না পাওয়াকে পরিহাস করে
কখনোই অতীতের নিষ্ঠুর বাস্তবকে
অস্বীকার করতে পারো না।
পারো না এক রুক্ষ হৃদয়কে ঠেলে ফেলে দিতে।
যা তোমার হৃদয়ের একবিন্দু ভালোবাসা
পাওয়ার আশায় তৃষ্ণার্ত।
তুমি কখনই পারো না
পথ ভ্রষ্ট পথিককে মরিচীকার ভ্রমে ঠেলে দিতে।
তুমি কি শুনছো? আজও, হ্যাঁ আজও
আমি তোমার জীবনে রয়েছি জ্বলন্ত প্রদীপের
তলার অন্ধকার ছায়ার মতো
তুমি কী অনুভব করেছো
ঐ অন্ধকারকে এতটুকু আলো দেওয়া
বিন্দুমাত্র প্রয়োজন।
তবুও যেনে রেখো আমি তোমার
অপেক্ষায় বিদগ্ধ শলতের ন্যায় রয়েছি নির্বাক।
শুধুমাত্র একবার শোনার অপেক্ষায়
তুমি আমায় ভালো বাসো।

একটুকরো স্বর্গ

অভিষেক গুপ্ত
প্রথম বর্ষ

ছেঁড়া স্বপ্নের মতো ফিরে আসে স্মৃতির কোলাজ,
সফেন ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছিল পাড়ে
শঙ্খচিলের দল সার বেঁধে বাসায় ফিরছিল।
তুমি গাঢ়ভাবে ছুঁয়েছিল আমায়,
পাইন আর বার্চ গাছের মাঝে।
আকাশে মেঘের টুকরো টুকরো স্বপ্নভেলা,
একটুকরো স্বর্গ ঘিরে রয়েছে আমাদের।
জানি তোমার কাছে সন্ধ্যামালতী আছে রাখা।
বৃষ্টিভেজা কত ফুটপাথে হেঁটেছি পাশাপাশি,
তুমি কাজলচোখ মেলে চেয়েছ আমার দিকে,
শুনেছি পায়ের নীচে ঝরা পাতার মর্মরধ্বনি।
একই ছাতার তলায় আমরা দুজনে,
একটা ছাতার তলায় একটুকরো স্বর্গ।
আমাদের সাজানো বাগানে,
চেরি আর পপির সমারোহ।
মধ্যিখানে ছোট্ট পুকুর,
তাতে নীল জল, গোলাপি পদ্ম।
পুকুরের ধারে ছোট্ট ফিঙে
শিস্ দিয়ে ডাকে বুলবুলিকে।
একটুকরো স্বর্গ—
ঘিরে রয়েছে তোমাকে আমাকে।

কোথায় অর্জুন

শ্রী দীপ্তিমান ভাণ্ডারী
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

হাতে আমার আজ আগুনের গোলা।
চোখে মুখে বিদ্ধ হয়েছে সেল।
নাক কান কেটে দিয়েছে
কোনো এক অজ্ঞাত লক্ষ্মণ— সূর্পনখার মতো।।

গোবী মরুভূমির বাসিন্দা আমি আজ।
ভিসুভিয়াস আমাকে ডাকছে,
.... অস্ফুটে, নীরবে।
জালিয়ানওয়ালাবাগে রাখা আছে
আমার লক্ষ্যবস্তু।।

বিজিত ক্রুদ্ধ কর্ণ আজ ফিরে এসেছে
—প্রতিবিধিৎ সাতে।
কিন্তু, কোথায় অর্জুন।
শরশয্যায় শায়িত একা ভীষ্ম।।

মেসোপটেমিয়ার জলে
উর্বশী ঢেলেছে গরল।
অসুর বধের সময় এসেছে আজ।
তাই, সাবধান বন্ধু...
মানুষ হয়ে নাম লিখিওনা
দানবের দলে।।

বন্দী

শুচিস্মিতা রায়
তৃতীয় বর্ষ (কলা)

দশতলার ঐ ফ্ল্যাট বাড়িতে
ছোট্ট একটা ছেলে,
জানলা দিয়ে আকাশ দেখে
পড়াশোনা ফেলে।
ছবি আঁকে খাতার পাতায়
ভুল হয়ে যায় পড়া
মন যেন তার চড়ুই পাখি
কঠিন তাকে ধরা।

দশতলার ঐ ছোট্ট ঘরে
সকাল আসে চুপিসারে—
ছোট্টছেলে কেঁদে মরে
আকাশ হবার বায়না ধরে,
ঘুড়ির সাথে উড়তে চায় সে
পড়াশোনা ফেলে
জান্‌লা দিয়ে আকাশ দেখে
ফ্ল্যাটবাড়ির সেই ছেলে।।

এষা

শ্রাবন্তী পাল
দ্বিতীয় বর্ষ

জানি না, মেয়েটাকে চেনো কি না তোমরা,
হয়তো চেনো, হয়তো বা চেনো না
তাতে কি বা যায় আসে?
আমি চেনাবো তাকে, নতুন করে
সে বাঁচবে আমার মাঝে
চিরটা জীবন ধরে।
মেয়েটা বড় ভালো— সরল ছিল।
দু'চোখ দিয়ে দেখত পৃথিবীকে,
বুঝতো না, পৃথিবীটা বিকিয়ে গেছে
মেকি জিনিসের মাঝে।
তাই, সে না বুঝেই ভালোবেসেছিল,
প্রেমে পড়েছিল, এক রূপবান ছেলের।
ঘৃণার মাঝেই ভালোবাসা,
তাই ঘৃণার থেকেই শুরু হোল
ভালোবাসার পথ চলা।
ঘৃণার ধিক্ ধিকে আগুনে পুড়ে,
সে ভালোইবেসে ফেলল ছেলেটাকে।
জানতে দিল না পোড়ারমুখী,
জ্বলছে যে প্রেমের আগুনে
দগ্ধে দগ্ধে মরছে, আবার মরার মাঝেই
তিল তিল করে বেঁচেছে।
মনে মনে ডেকেছে, বলেছে "ভালোবাসি.
ভালোবাসি তোমায় আমি।"
বুক ফেটেছে, মুখ ফোটে নি।
চোখের জল গাল গড়িয়ে,
মুখ ভাসিয়ে
বুক শুকিয়ে হারিয়েছে।
তুব পারে নি, জানতে সে—
চোখের ভাষা, প্রাণের তাগিদ।
প্রণয় ডোরের বাঁধন শিথিল হতে হতে
খসে গেল হৃদয় থেকে।
তবু এল না, সেই ছেলেটা—
যাকে ভালোবেসেছিল
আমার এষা।।

বেঁচে থাকার সহজ উপায়

পায়েল সেনগুপ্ত
দ্বিতীয় বর্ষ (বিজ্ঞান)

বাঁচ তুমি, বাঁচি আমি
বেঁচে থাকি সবাই
কেউ বলে, বাঁচতে গেলে
গানটি গাওয়া চাই।
এমন অনেক মানুষ আছে,
বাগান বড় ভালোবাসে
আবার এমনও অনেক আছে
যারা বাঁচে জুয়া ও তাসে।
কেউ বা বাঁচে মুখটি বুজে
মোটা বইয়ের পাতায়
দিন যায়, রাত কাটে, তার
না আসে, না যায়।
কেউ বা কবি, ছোট রবি
কলম ধরে বাঁচে,
সৃষ্টি তার বেচে বাজারে
দোকানী তাই বেঁচে থাকে।
আছে শ্রমিক, আছে কৃষক,
পায়ে ফেলে মাথার ঘাম
বেঁচে থাকে কঠোর পরিশ্রম করে,
পায় না সঠিক দাম।
আমি থাকি সবার মধ্যে, এই
ক্ষুদ্র, ছোট্ট আমি
কর্মময় বৃহৎ পৃথিবীতে
বেঁচে থাকতে আমি জানি।

বসন্ত বিলাপ

অভিজিৎ ধর
প্রথম বর্ষ (বি. এস. সি.)

সোম থেকে শনি
প্রবল খাটুনি
মাঝে মাঝে চা পাই,
আধ পেয়ালা,
তাও কভু মধুমেয়
কভু গুড়গোলা।

তাতেও ছিলাম বেশ
কিছুই বলিনি।
তখনো সমুহ বিপদ আসছে
সেটাই বুঝিনি।
এইতো সেদিন, গেল বুধবারে,
পৌঁছে অফিসে, বসতেই চেয়ারে
দেখি টেবিলে,
ফাইলের রাশি,
কিছু কারেন্ট,
কিছু বাসি।

বলতে যাব ভাবতেই
দেখি সমুখে 'বস'।
কাষ্ঠ হাসি হেসে বলি, এবার কি স্যার,
প্রফিঠ এন্ড লস?
কবে নাগাদ দিতে হবে?
এই শনিবারে?
না, মানে হয়ে যাবে
কয়দিন বাদে।

ব্যস, হয়ে গেল,
বন্ধুর সাথে বেড়াতে যাওয়া
ময়দানে, ঠান্ডা হাওয়া
আর বাদাম খাওয়া।
সকাল থেকে যে সন্ধে
এই টেবিলে হায়,
আমার বসন্ত কেটে যায়।

জীবনের অঙ্গ

ইন্দ্রনীল মিত্র
প্রথম বর্ষ (বি. এস. সি.)

হাসি, কান্না সুখ দুঃখ
জীবনের এই চারিটি অঙ্গ,
এদের নিয়ে জানকি তুমি
হয় জীবনে কত যে রঙ্গ।
জীবনে মানুষ কত যে করে
সুখের জল্পনা
যারা হয়ে যায় অনেক সময়,
জলের আলপনা,
জীবনে মানুষ চলার সময়
নেয় অনেকের সঙ্গ,
স্বার্থ তাদের ফুরিয়ে গেলেই,
করে ভালোবাসা ভঙ্গ
মানব জীবন একটি মেলা
ঘটেযে তাতে কত ঘটনা,
জীবনকে কর আরো সুন্দর,
মনে হয় যেনতা
কাব্য রচনা,
জীবনের পথে চলতে গেলেই
মানুষ হওয়াটাই বঞ্চনা,
কান্না দিয়েই হয়ে যে তাদের,
জীবনটারই সূচনা।

"পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে-আসে— সব নদী-ফুরায় এ জীবনের সব
লেনদেন ;
—জীবনানন্দ দাস।

র‍্যাগিং

সোমদত্তা মুখার্জী
প্রথম বর্ষ (কলা)

মায়ের গয়না বেচে ভিটেমাটি বন্ধক রেখে
পড়তে এসেছিল ছেলেটা
এসেছিল বাপ-মায়ের মুখে ক্ষুধার অন্ন
তুলে দেবার প্রয়াস নিয়ে।
সারাদিনের পরিশ্রমের পর যখন
দুটো ভাত চেয়েছিল— পায়নি।
তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল
সিলিং এর সঙ্গে।
কিভাবে শ্রান্ত প্রাণটা চনমনে হয়ে
ছট্‌ফট্ করে সেটাই দেখছিল
নির্বোধ, লোলুপ, হিংস্র চোখগুলো।
যখন প্রাণটা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে
আসছিল তখন তাকে নামানো হল
ধিকি ধিকি প্রাণটা হা করে
কি একটা বলতে চাইছিল—
পারল না।
মজাপেয়ে আনন্দে নেচে ওঠা
চোখের মালিকদের একজন বলেছিল
ধুর, ক্রিটিক্যাল কিস্যু নয়,
বাথরুমে নিয়ে গিয়ে শাওয়ারটা খুলে দে।
বাকি চোখের মালিকরা গোলাম হয়ে
আদেশ পালন করেছিল।
হার কনকনে শীতের রাতে একটা হৃদপিন্ড
ক্রমশঃ নিস্তেজ হতে হতে হঠাৎ থেমে গেছিল
সেদিন।
পরদিন নিস্তেজ প্রাণটার মজা দেখতে
সেই চোখগুলো আবার হাজির হয়েছিল,
কিন্তু বাথরুম থেকে বের করেছিল
কেবল একটা হত দরিদ্র, বিস্ফারিত নেত্র
প্রচন্ড চেষ্টা করে জীবনে হেরে যাওয়া
একটা লাশকে।
অথচ আশ্চর্য।
কেন জানিনা— সেই নৃশংস চোখগুলো
কোন শাস্তি পায়নি।
আমারও হঠাৎই নিশ্চুপ হয়ে গেছিলাম।
এক দরিদ্র বাপমায়ের ছেলে মরুকনা
তাতে আমাদের কি?
বরং ভালোই হল
দেশের জনসংখ্যা কমল একজন।
মরুক না বাপ মা ছেলের শোকে, না খেতেপেয়ে
সেন্সস রিপোর্টে জনসংখ্যা আরও কমবে।
ছেলেটি তো আর আমাদের নয়
আর
বাপ-মাও আমাদের নয়।
আমরা কেন প্রতিবাদ, করব?
কেন দুঃখ করব?
দুঃখিনী মা হল ভিক্ষারিনী পাগলিনী...
আমরা স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক
স্বগর্বে মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখেছি।
দেশাত্মবোধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে
দেশকে রক্ষার সুমহান দায়িত্ব নিয়েছি।
এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে
মাথা ঘামালে কি চলে!
কিন্তু কিন্তু...
সেই ধিকি ধিকি প্রাণটা হাঁ করে কি বলতে চাইছিল?
চোখের মণি ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল
গাল বেয়ে কষ গড়িয়ে পড়ছিল।
আমায় বাঁচতে দাও
আ-মা-য় বাঁ-চ-তে-দা-ও...
শেষে চিতায় তোলা হল লাশটাকে
চিতার আগুন জ্বলে উঠল দাউ-দাউ করে।
সেই আগুন এতই গোপনে, নিঃশব্দে
আমাদের পোড়াতে লাগল আমরা তা বুঝতেও
পারলাম না।
কে যেন ফিসফিসিয়ে চিতা থেকে বলতে লাগল
আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম
আ-মি-বাঁ-চ-তে— চে-য়ে-ছি-লা— ম!...

পরে কোনো দিন

ইমরান আমেদ
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

"যুদ্ধ মন্ত্রক"— বড় আশ্চর্য, অবাক করা কথা। পৃথিবীতে আজ যতগুলি দেশ আছে তাদের কারোরই বোধহয় 'যুদ্ধ মন্ত্রক' নেই, কিন্তু আবার "প্রতিরক্ষা মন্ত্রক" নেই এমন কোন দেশও বোধহয় এই পৃথিবীতে তৈরী হবে না। আজও নেই। আচ্ছা, যদি যুদ্ধই না হয় তবে প্রতিরক্ষার কাজ কি? কি দরকার এই প্রতিরক্ষার.... প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের? হয়তবা দরকার। তার প্রমাণ এই পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোম।

"না, না, এপ্রস্তুতি কেবলই আত্মরক্ষার জন্য। এই বোমা কারোর ক্ষতি করবে না।" তবে কেন এই অস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগীতা— কেন এত মাথাব্যথা? কেন?

কাকে দোষ দিচ্ছি। দোষটা তো আমাদেরই, আমাদের সমাজেরই। যখন ছোট ছিলাম তখন থেকেই শুনে আসছি রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধ বীরত্ব— অর্জুন, ভীমের বীরত্বের কথা। ছোট থেকেই যুদ্ধের নাম শুনলে আমাদের কেমন গর্ববোধ হয়। এই কারনেই নেপোলিয়ান বা বীর আলেকজান্ডারের কথা আমরা মনে করি সমীহের সাথে। সেরকমই আজকের পারমাণবিক শক্তি সম্পন্ন দেশগুলি... আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, জার্মানী— এদের কথাও আমরা মনে করি সমীহের সাথে হয়তবা ভয়ে ভয়ে।

কিছুদিন আগে এক সমীক্ষায় পড়লাম যে, আজ তেজস্ক্রিয়তা থেকে পৃথিবীতে মুক্ত করতে সবচেয়ে কম যে সময় লাগবে তা চারশো বছর, আর বেশী হলে— চবিব্শ হাজার বছর (সূত্র ঃ আনন্দবাজার)।

যুদ্ধের মধ্যে এক হারজিতের ব্যাপার থাকে। কিন্তু, পারমাণবিক যুদ্ধে জয়ের কোন স্থান নেই। শুধই হার। এখন তা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে হতভাগ্য হিরোসিমা-নাগাসাকির নির্দোষ মানুষরা, কষ্ট পাচ্ছে বিকলাঙ্গ পঙ্গু শিশু।

তাই আজই এই তেজস্ক্রিতাকে নষ্ট করার কাজে নামা উচিৎ তাহলে যদি আমাদের ৪০০ বছর পরের উত্তরসূরীরা সুস্থভাবে বাঁচতে পারে...

"আমি-আমি জানাবো—
সবাইকে জানাবো। এবার
—কিছু হবে না। এখন—
এখানকার মানুষদের—
কিছু হবে না। কিন্তু পরে—
পরে কোনদিন-ভবিষ্যতে—"

[—পরে কোনদিন]

ক্রীড়াঙ্গন এক প্রমোদ তরনী!

অর্ক রাজপণ্ডিত
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

এই মুহূর্তে পাঞ্জাবের ধূলো-ধোঁয়ায় আকীর্ন এক অখ্যাত শহরের কারখানায় ছোট্ট এক শিশু শ্রমিক রিয়াজুল চামড়ার প্যানেলগুলো মিলিয়ে একটা ফুটবল তৈরী করছে। স্পোর্টস গুড্‌সের মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি রীবক, ফুটবল তৈরী করছে। স্পোর্টস গুড্‌সের মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানি রীবক, নাইকে কিংবা অ্যাডিডাস হয়তো সেই ফুটবলটারই এরিক কাঁতোনা বা দেল পিয়েরোর হাতে ধরিয়ে ছবি তুলবে। বহুবর্ণ সেই ব্লো আপ্ এ জনপ্রিয় দুই ফুটবলারের স্বাক্ষর থাকবে, হয়ত শ্লোগানও থাকবে এরকম— 'Eric the king' কিংবা 'Del Piero the prince'। এসবের হদিশ জানেনা রিয়াজুল। সারাদিন চোদ্দ-পনেরো ঘন্টা কাজ করে দুটো ফুটবল শেষ করতে পারে। যা মজুরি পায়, তাতে শুধু একলিটার দুধ কেনা যায়।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন স্পনসর বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানি উইলস্ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে সতর্ক করে দিয়েছিল। শ্রীনাথ যে স্বপ্নের বোলিং করে ছিটকে দিয়েছিলেন ইনজামামের মিডল স্টাম্প, স্বয়ং হোল্ডিং বলেছিলেন 'জেম অফ্ এ ডেলিভারী!' অথচ এই ডেলিভারী নিয়েই বিপত্তি। একই অপরাধ রাহুল দ্রাবিড়ের। ভারতীয় টিমকে ভরাডুবির হাত থেকে সাতানব্বই রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে বাঁচিয়ে ছিলেন। আই. টি. সির অভিযোগ শ্রীনাথের আউট সুইঙ্গার আর দ্রাবিড়ের কভার ড্রাইভ উইলসের লোগো সুপার স্লো মোশানেও দেখা যায়নি! তাদের এক কথা, টাকা দেব অথচ সেরা বল বা শটে তাদের লোগো দেখা যাবে না মাঠের নটা ক্যামেরায়? ভারতীয় বোর্ড কথা দিয়েছিল এমন ঔদ্ধত্য ভবিষ্যতে দেখাবেন না শ্রীনাথ ও দ্রাবিড়।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সব ঋতুতে অবিরাম ক্রিকেট কেন? কাদের বিনোদনের জন্য বৃটিশ কলোনিগুলোতে সারাবছর ক্রিকেট। এর জবাব পেতে যেতে হবে কোক্, পেপসি বা ওয়ার্ল্ড টেল দের কাছে। 'উইলস্ ফ্রেক নন্‌স্টপ টেনিস মানে কি? সাড়ে তিন ঘন্টার পাঁচটা সেট কতটা নুন, চিনি, জল শরীর থেকে নিংড়ে নেয়? ফ্রান্সের জিদান বা ইতালির দেল পিয়েরো গোলের পরে সতীর্থদের আলিঙ্গন এড়িয়ে জার্সি তুলে লোগো দেখাতে ছুটে যায় টিভি ক্যামেরার দিকে। এসব প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কোকাকোলা জানে! মাত্র দশজন ভাগ্যবানকে ইংল্যান্ডে উড়িয়ে নিয়ে কত কোটি প্যাকেট বিস্কুট বিক্রি বাড়িয়ে নিয়েছে ব্রিটানিয়া? আকাই, সামসুঙ্, এল. জি. কি মনোহর লবেঞ্জুস দেখিয়ে একমাসে পাঁচ লক্ষ টিভি বিক্রি করেছে! ফাউ এর জন্য টিভি না টিভির জন্য ফাউ? সারা দেশকে ক্রিকেট থেকে উইম্বলডন কিংবা কোপা আমেরিকায় আটকে রাখার কি ঢালাও ব্যবস্থা! অথচ তৃতীয় শ্রেণীর র‍্যাকেটের দাম আমাদের দেশে ন্যুনতম তিন হাজার টাকা। এসব জটিল সংশয় আমার জন্য নয়। আমি কিছুই জানি না। সব জানে কোক্ আর পেপ্‌সি। স্পোর্টস ইম্পিরিয়ালিজম্ বলে শব্দ উঠেছে। খেলাধূলায় আবার সাম্রাজ্যবাদ কোথায়? আমি সত্যিই এসব জানি না। সব জানার উত্তর কোকাকোলাদের কাছে!

বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটস্‌ম্যান সুনীল গাভাসকারকে খুব কড়কে দিয়েছে আজাহারউদ্দিনের স্পনসররা। দলের নিদারুন বিপর্যয়ের সময় আজাহার কীভাবে নির্বিকার ঔদ্যাসীন্যে স্বঃনির্মিত ঘেরাটোপে বাস করেন? দলের

অধিনায়ক এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্‌ম্যান হয়েও কেন সংকটের মুখে তিন থেকে চারে, চার থেকে পাঁচে প্রায় ব্যাটিং অর্ডারের লেজের মুখে নিজেকে নামিয়ে আনছেন? এসব কিছুই সংবাদপত্রে লিখতে পারবেন না গাভাসকার। কেন না পেপসি আর উইলস্‌ যে উচ্চতায় তাঁকে তুলে দিয়েছে, সেই বেলুনটা চুপসে যাবে। সুতরাং দেশের সম্মান নিয়ে গাভাসকার মাথা ঘামাবেন না! ও দায়টা পেপসিদের। ক্রিকেট পৃথিবীতে দরিদ্র তৃতীয় বিশ্বের দেশ বাংলাদেশ। কিন্তু ক্রিকেট যেহেতু অনিশ্চয়তায় খেলা সেহেতু সন্দেহাতীতভাবে পাকিস্তানকে তারা হারিয়ে দিল। কী গভীর বিশ্বাসযোগ্যতাই না পেল বিখ্যাত Uncer tainity এর তত্ত্ব! এই অঘটনের দুদিন পড়েই সংবাদ মাধ্যম কী করে জানলো, ৯৯ থেকে ২০০১ এই আড়াই বছরে বাংলাদেশে ক্রিকেট আর তার পন্য সামগ্রীর বানিজ্য হবে আড়াই কোটি টাকা!

খেলাধূলা এখন আর ক্রীড়াজগতের সংগঠকদের সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত হয়না, এখন সবই কর্পোরেট ডিভিশন! অলিম্পিকের দৌড়ে একই প্রতিযোগী যদি দুটো আইটেমে নাম দেয়, তবে তৃতীয় বিশ্বের হতদরিদ্র স্প্রিন্টারদের ২০০ আর ৪০০ মিটারের হিটে একই দিনে তিন ঘন্টার তফাতে নামতে হয় কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নেই। খেলা ধূলার মধ্যেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ব্রাজিলের ফরমূলা ওয়ান কার রেসিং-এর হিরো, আয়ারটন সেনার মৃত্যুতে ব্রাজিলের জাতীয় শোকের সঙ্গে কীভাবে কলকাতার গলিতে রবারের বল খেলা কিশোরেরা তীব্র দুঃখে শোকার্ত হয়ে উঠছে? কত বর্গ মাইল অরণ্য কেটে চোখ জুড়ানো মখমল— সবুজ গলফ্‌ কোর্স তৈরী হয়? গভীর অরণ্যে রাত্রি যাপনের স্বপ্ন দেখা আমার বোন, পর্বতপ্রেমী আমার ভাইয়ের কী করে ভালো লাগে সম্পূর্ণ প্রথম বিশ্বের বিপুল বৈভবের খেলা গলফ্‌? এসবের উত্তর কোকাকোলাদের কাছে। এটাই গ্লোবালাইজেশন। দায়হীন শোষণ আর বঞ্চনার সীমাহীন বিশ্বে, বিশ্বব্যাপী নির্বিকার নির্মমতার অচিন্ত্যনীয় আয়োজন।

খেলাধূলা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এ বিশ্বের বহু বিচিত্র বৈশিষ্ট্যকে এক সমতলে নিয়ে আসার কাজ চলছে। এপৃথিবীর সবকিছুই হবে মার্কিন সংস্করণের প্রতিরূপ। খেলাধূলা, সমর, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সবকিছুই এখন মার্কিন খাদ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত। বর্তমান এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অবিমিশ্র ভোগবাদেরই ঘনীভূত রূপ। আটলান্টিকের ওপার থেকে যা উঠে আসবে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে তাই পান করবে তৃতীয় বিশ্ব। ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে উয়েফা কাফ, সঙ্গীত থেকে চিত্রকলা, টেলিভিশন, মাল্টিমিডিয়া, ইন্টারনেট— এ এক অনন্ত প্রস্রবন। শিল্প-সংস্কৃতি কোন দিন এত তীব্র শরীরী চেহারা নিয়ে হাজির হয়নি। সারা বিশ্বের মানুষ হৃদয়বৃত্তির কোনে সক্রিয়তার অবসর বিনোদন করবে— এটা তার দেশজ বৈশিষ্ট্য। পরিচিত পটভূমির অবিভাজ্য অনুষঙ্গ নয়। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ যে তাদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক সম্পদের পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এই উপলব্ধির অবকাশ পর্যন্ত দিচ্ছেনা মার্কিন বে-আব্রু সন্ত্রাস।

খেলাধূলা, শিল্প-সংস্কৃতির এক বিশ্বরূপ দেখছি আমরা। এক অপার বিস্ময়-দর্শন। কোন কিছুর সঙ্গেই সংলগ্ন নয়। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী দর্শনের ধ্বংসাত্মক চরিত্র নিয়ে বিশ্বায়ন ঝাঁপিয়ে পড়ে গিলে খাচ্ছে খেলাধূলার জগতকেও। নাভিশ্বাস উঠছে ক্রীড়াঙ্গনে। না মূল্য, না সৃষ্টি, এ এক অযোনী সম্ভূত শক্তি! মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়াঙ্গনের সততার এপিটাফ রচনার কাজ প্রায় শেষ। সর্বত্র শোক সঙ্গীতের বিষন্ন রুদালী। তবু মানুষ চুপ। এখনো তারা এই সাম্রাজ্যবাদ, মানুষ-মারা বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গর্জে ওঠে না।

অতএব.....।

সিগারেট ধূমপান ও তার প্রভাব

তরুণ মান্না
প্রথম বর্ষ (বিজ্ঞান)

CIGARATTE শব্দটির প্রতিটি বর্ণই এক একটি রোগের প্রতীক।

'C' — **Cancer.**
'I' — **Iscomic heart disease.**
'G' — **Gastric Ulcer.**
'A' — **Athreosclerosis.**
'R' — **Respiratory disease.**
'E' — **Emphyseme.**
'T' — **Thromboembolic disease.**
'E' — **Eye disease.**

তাই সিগারেট ধূমপানের এই বদ-অভ্যাসটা বিষের মত ত্যাগ করা উচিৎ, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর' এটা সকলেই জানে, তা সত্ত্বেও পৃথিবীতে ধূমপায়ীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমাদের ভারতবর্ষে সিগারেট ধূমপান একটা আভিজাত্য বা অনুকরনই বলা যেতে পারে। অনেক সময় এটা মানসিক চিন্তা লাঘব করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সিগারেটের উপর লেখা "CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH" বাক্যটি প্রবাদ হয়েই রয়ে গেল। এর ক্ষতিকর প্রভাবের কথাটা মানুষ ধূমপানের সময় মনে রাখে না একটা সিগারেট গড়ে ৫ মিনিট করে আয়ু কমিয়ে দেয়। সিগারেটের মধ্যের নিকোটিন খুবই ক্ষতিকারক। ফুসফুসের উপর এটি একটি আবরণ সৃষ্টি করে। সিগারেট ধূমপানের সময় নির্গত ধোঁয়াকে যদি একটি সাদা পরিস্কার কাপড়ের মধ্যে ধরা যায় তাহলে দেখা যায় কাপড়ের উপর একটা হলুদ বর্ণের আস্তরণ পড়েছে। ফিল্টার বিহীন সিগারেটগুলি আরো ক্ষতিকারক। সিগারেট ধূমপানের ফলে নির্গত কার্বন-মনোক্সাইড অক্সিজেন পরিবহন কমিয়ে ফুসফুস ও মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করে। আর এর থেকে উৎপাদিত হাইড্রোজেন সাইনাইড ধুলোবালি আটকাতে সক্ষম শ্লেষ্মা ঝিল্লির রোঁয়াগুলোকে নষ্ট করে দেয়। এছাড়া নাইট্রোসামাইন, হাইড্রোজিন, ফেনল, ফ্রেসল প্রভৃতি ক্ষতিকারক পদার্থগুলি সিগারেটে থাকে যা ফুসফুসের ক্ষতি করে এবং রোগ সৃষ্টি করে।

টুকরো হাসি

— ও কি হাঁদু! তুমি একপায়ে বুট অন্য পায়ে চটি পরেছ কেন?
— আপনি বলেন, বাপ মায়ের কথা সব সময় পালন করা উচিত। কাল বাবা-মায়ের ঝগড়া হয়েছিল। আজ সকালে মা বললেন বুট পরে যেতে, আর বাবা বললেন চটি পরে যেতে। তাই কী আর করি? দুজনের আদেশই এক সঙ্গে পালন করেছি।

— জয়ন্ত সাহা

রূপকথা বনাম রূপোলী পর্দা ঃ কিছু ভাবনা

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত
অধ্যাপিকা

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর মুখে পথের হদিশ নিয়ে, পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে রাজপুত্তুর যায় কুঁচবরণ মুখশ্রী আর মেঘবরণ কেশের রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। আর তারপর রাক্ষস খোক্কস, দৈত্যদানোর সঙ্গে দারুণ এক লড়াইয়ের শেষে রাজকন্যাসহ ফিরে এসে সুখে ঘরকন্না আর রাজত্ব করে সে। এই সবটুকুর সঙ্গেই জড়িয়ে থাকে ছেলেবেলায় ঠাকুমা দিদিমার কোলের কাছে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে গোল-গোল অবাক চোখে তাকিয়ে গল্প শোনার স্মৃতি। অন্ততঃ আমাদের প্রজন্ম পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে শৈশবের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্মৃতিচিত্র এইটিই। রূপকথার গল্প তখন আমাদের সামনে একটা স্বপ্নের জগতের দরজা খুলে ধরত। মনের কোণে লুকিয়ে থাকা ইচ্ছাগুলোই যেন জীবন্ত হয়ে উঠত ওই গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে।

সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কৃষ্টিবলয়েই রূপকথার মাধ্যমে এই ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটির খোঁজ মেলে। এ শুধু শিশুর অসংলগ্ন ইচ্ছের কল্পনাপূরণ কিংবা জাগর-স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া পরিতৃপ্তিই নয়, আরও বৃহত্তর একটি পরোক্ষ সামাজিক আকাঙ্খা চারিতার্থতার বিষয়টিও সেখানে সমান ক্রিয়াশীল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি শিশুর কাছে শুধুই স্বপ্নের জিনিস 'অধরা মাধুরী', তাই রূপকথার গল্পের জগতে এই 'অধরা মাধুরী' যে রাজপুত্র বা রাজকন্যার কাছে সহজলব্ধ, অচেতনভাবে তাদের শিশু নিজেকে একাত্ম (identify) করে ফেলে। গল্পের জগতে সে নিজেই তখন হয়ে ওঠে রাজপুত্তুর বা রাজকন্যে! না-মেটা বাসনাগুলো রূপকথার তেপান্তরের মাঠে পক্ষীরাজের ডানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলে— শিশুর মনকে চরিতার্থ করে। রূপথা তখন আর নিছক কাহিনীমাত্র থাকে না, হয়ে ওঠে মানসতৃপ্তির সবচেয়ে বিশ্বস্ত হাতিয়ার।

শুধু শিশুরাই নয়, গল্পের কথক প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একধরণের সামাজিক আকাঙ্খা চরিতার্থতার মনোবৃত্তি কাজ করে। সাধারণভাবে রূপকথার রাজকন্যা-রাজপুত্র-রাজামশাই-রানীমা-মন্ত্রী-কোটালরা সামাজিক সোপানের যে-স্তরের বাসিন্দা, গল্পের কথকেরা তার থেকে অনেক নীচের সিঁড়ির মানুষ, যাঁরা সামাজিক জীবনে নিপীড়িত, অত্যাচারিত হয়ে থাকেন ওই উচ্চবর্গীয়দের দ্বারাই। কিন্তু এক আশ্চর্য অবচেতন— মানসউত্তরণের (transcendence) ফলে ওই অত্যাচারিতেরা নিজেদের সমীকৃত করে ফেলেন— মনে মনে হতে চান, হয়ে ওঠেন ঠিক ওই রাজপুত্র-রাজকন্যা ইত্যাদিই। আর বাস্তবের ওই অত্যাচারী উচ্চবর্গীয়েরা রূপান্তরিত হয় রাক্ষস বা ছদ্মবেশী রাক্ষসী সুয়োরানীতে। কখনো কখনো অবশ্য রাজাও দুয়োরানীকে ত্যাগ করেন সুয়োরানী-সাজা রাক্ষসীর মায়ায় ভুলে। তবে সেখানেও ক্রিয়াশীল সামাজিক একটি গূঢ় বক্তব্য ঃ যেমনভাবে শ্রেণী-সমাজের শাসককুল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভুল পথে চালনা করে, এখানেও ব্যাপারটা ঠিক তেমন-ই ঘটে। আরো একটা জিনিস লক্ষণীয় ; কখনো কখনো শ্রেণীসচেতনতার কথা সরাসরিই আসে কোনো সময় ঘুটেকুড়ুনীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ, আবার কখনো বা কাঠুরের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহের মাধ্যমে।

যে কোনো রূপকথার পরিনামেই ভয়ানক এক যুদ্ধের পর রাক্ষস-দৈত্য-ডাইনীরা মারা যায় রাজা বা রাজপুত্রের হাতে ; বন্দিনী রাজকন্যা মুক্তিপায় আর তারপর সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাজত্ব করে তারা। অথবা, রাক্ষসী সুয়োরানী ধরা পড়ে

রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয় বা তার মৃত্যু ঘটে এবং দেশে শান্তি ফিরে আসে। বাস্তবে যে অত্যাচারের প্রতিকার সাধারণ মানুষ করতে পারেন না, এমন কি প্রতিবাদ করার কথাও ভাবতে পারেন না ; রূপকথার কল্পনার জগতে নিজেকে রাজপুত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে অত্যাচারী রাক্ষসকে বধ করার মাধ্যমে তাঁদের সেই অপূর্ণ বাসনারই পরিতৃপ্তি ঘটে। আর তখনই সাধারণ মানুষ একাত্ম হয়ে যান রূপকথার জগতের সঙ্গে। তাই যে কোনো রূপকথারই পরিণতি অনাবিল সুখের, যা মনে এক অপূর্ব পরিতৃপ্তির আমেজ ছড়িয়ে দেয়। একে হয়তো মানস চরিতার্থতার একটা মাত্রাও বলা যেতে পারে। আর এই কারণেই রূপকথার কাহিনী কখনো পুরনো বা বাসি হয় না।

রূপকথার জোরদার প্রতিপক্ষ হিসেবে এখন এসেছে বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম বিশেষ করে টেলিভিশন ও সিনেমা। কানে-শোনা গল্পের বদলে চোখের সামনে ঘটা কাহিনী দৃশ্যচিত্রের মাধ্যমে এই ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারটি আর নিছক মানসকল্পনায় নয়, সরাসরি প্রত্যক্ষভাবেই দেখা যাচ্ছে বড়ো বা ছোটো পর্দায়। মহার্ঘ পোশাকে অলঙ্কারে সুসজ্জিতা নায়িকা, দামি বিলিতি গাড়ি, ঝাঁ চকচকে বাংলো বা প্রাসাদওয়ালা নায়ক, সর্বাঙ্গীণ স্বাচ্ছল্য, আরাম আমোদপ্রমোদ এবং সর্বোপরি বিলাসবৈভবে ভরপুর এক রঙিন জগৎকে মানুষের চোখের সামনে মেলে ধরে সিনেমা। বাস্তব জীবনে বঞ্চিত মানুষেরা ওই তৈরী করা স্বপ্নের জগতের সঙ্গে নিজেদেরকেও একাত্ম করে ভাবতে থাকেন স্বাভাবিক মানবীয় প্রবণতার বশেই। রূপকথার অনাবিল আনন্দময় জগতের বদলে সর্বপ্রকার স্বাচ্ছল্যমণ্ডিত অতি-আধুনিক এক জীবনের স্বাদ পান তাঁরা যা বাস্তবে তাঁদের অনায়ত্ত— তাই তাঁদের অতৃপ্তি আরো বেড়ে যায়। কারণ রূপকথার পুরোটাই যে অবাস্তব রাক্ষস-খোক্কস, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় ঘেরা নিছকই গল্পকথার জগৎ সেটা তাঁরা বোঝেন রূপকথা মানসপরিতৃপ্তির একটা আয়ত্তগম্য মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু টিভি-সিনেমার পর্দার জগৎটি একান্তই বাস্তব। অন্ততঃ কিছু শ্রেণীর উচ্চবর্গীয় মানুষদের কাছে, যাঁরা সত্যিসত্যিই ঐ ঝাঁ-চক্‌চকে গাড়ি, মহার্ঘ পোষাক, আর বিলাসী বাংলোর জগতে বসবাস করেন। এই সাধারণ মানুষেরাও এও জানেন যে কিছু লোকের কাছে একান্ত বাস্তব ঐ-যে জগৎ, তার নাগাল নিজেদের জীবনে তাঁরা কোনোদিনই পাবেন না। তাই সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে নিজেদের অবচেতনভাবে সমীকৃত করে ভিলেনকে পরাস্ত করে সাময়িক তৃপ্তি পেলেও সামগ্রিক অতৃপ্তির বোধটি কখনোই তাঁদের মন থেকে পুরোপুরি মুছে যায় না। সিনেমার হিরোর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে, স্বচ্ছল উচ্চবর্গীয়দের ভিলেন হিসেবে কল্পনা করে তাকে হত্যা করে একধরণের অন্যায়ের প্রতিকার করার মনোবৃত্তি কাজ করলেও এটা মনে রাখতে হবে যে, রূপকথার জগতের ভিলেনরা ছিল রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্য-দানো অথবা ছদ্মবেশী রাক্ষসী রানী যাদের বধ করার মধ্যে প্রতিহিংসার থেকে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদটাই বেশি থাকত যা চিহ্নিত করত রাজা বা রাজপুত্রের বীরত্বকেই আর এই বীরত্বের স্বীকৃতি মিলত মেঘবরণ কেশ কুঁচবরণ কন্যার বরমাল্যে।

কিন্তু সিনেমার পর্দায় ভিলেনের মৃত্যুদৃশ্যে নায়ক তার প্রতিহিংসা (বরং 'বদলা' বলাই ভালো!) চরিতার্থ করে। আর সাধারণ দর্শকও মনে-মনে সেই প্রতিহিংসা চরিতার্থতারই স্বাদ পান। নায়কের প্রতিহিংসা চরিতার্থতার স্বীকৃতি মেলে সিনেমার সিংহভাগ জুড়ে থাকা নায়িকার বাহুবন্ধনে— তবে সে রূপকথার স্বপ্নের রাজকন্যা নয়— লাস্যে-কটাক্ষে পারদর্শিনী স্বল্পবসনা এক যৌন-প্রতিমা। তাই সিনেমার কাহিনীতে অ্যাডভেঞ্চারধর্মিতা বা বীরত্বব্যঞ্জনার বদলে নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হানাহানি, মারামারি, নৃশংসতা, অশালনীতা ও মাত্রাতিরিক্ত যৌনতারই গুরুত্ব অনেক বেশি। আর সরাসরি চোখের সামনে এগুলি দৃশ্যমান হয় বলে দর্শকের (বিশেষতঃ তারা যদি হয় অপরিণত মনের শিশু ও কিশোর মনে এর প্রভাব-ও ঢের বেশি। প্রায় হাতে কলমেই তাঁরা শিখে যায় কিভাবে 'অন্যায়-অবিচারের' প্রতিবাদ (!) করতে হয়, কিভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অশ্লীল ইঙ্গিতে মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। আর সিনেমার হিরোর সঙ্গে নিজেকে সমীকৃত করে ফেলেন বলেই নায়ক নিজের জীবনের সব অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য যা করছে দর্শক ভাবেন তিনিও

ঠিক সেই রকমই করতে পারেন— অন্ততঃ তাঁর অবচেতন অভীপ্সাটা তাই-ই থাকে। (মনে রাখতে হবে, সিনেমার নায়ক কিন্তু হত্যা করলেও শাস্তি পায় না)।

আর এইটিই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায় যখন সত্যিই-সত্যিই বাস্তব জীবনে কোনো শিশু, বালক বা কিশোর কোনো একান্ত নিজস্ব সমস্যার সম্মুখীন হয়। সিনেমার প্রভাবে তখন সে সেই সমস্যা সমাধানের পথ হিশেবে বেছে নেয় হিংসা ও হত্যাকে। কারণ অবচেতন মনে সে তখন নিজেকে 'হিরো' ভাবছে আর সে তো জানেই 'হিরো'র কাজই হল 'ভিলেন'কে মারার পর 'হিরোইন'কে দখল করা। রূপকথার অর্ন্তকাঠামো (infrastructure) থেকে সিনেমার গল্পের ছাচ না বদলালেও, তার মধ্যে এইভাবে একদিকে হিংস্রতা ও অন্যদিকে যৌনতার মিশেল হবার ফলে রূপকথার জগৎ থেকে সিনেমার জগৎ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

তাই ১৬-১৮ বছরের কিশোর-কিশোরী কিংবা ৮ বছরের শিশুও খুব অবলীলায় খুন করাতে ও করতে পারে নিজের বাবা, ভাই, মা ও বন্ধুকে। এবং ধরা পড়েও অনুতপ্ত বা ভীত হয় না কারণ তারা তো 'হিরো' হয়ে 'ভিলেন'কে মেরে জীবনকে সমস্যাহীন (!) করেছে, হাতের মুঠোয় এসে গেছে স্বাধীনতা, স্বাচ্ছল্য আর আমোদ প্রমোদের উপকরণ, যা তারা দেখেছে সিনেমার পর্দায়।

অপরিণত মন তলিয়ে ভাবতে পারে না সিনেমার পর্দায় দেখানো ঘটনার অসম্ভাব্যতাকে। তাই নিজেদের অজান্তেই তারা হয়ে ওঠে পাকা ক্রিমিনাল। রূপকথার স্নিগ্ধ জগৎ তাদের আকাঙ্খিত নয়। বাড়িতে টিভির পর্দায় অথবা সিনেমায় দেখা মারদাঙ্গা-খুনখারাপি, লুটতরাজ, ব্যাপক হিংসা, অরাজকতারও, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনই তাদের পছন্দ মেশিনগানের আওয়াজে, বাইকের গর্জনে, হেলিকপ্টারের পাখার গতিতে আর ফিল্মীনাচের উত্তেজক বাজনা ও অঙ্গভঙ্গীর তাড়নায় তাই আজ রূপকথার রাজকন্যা, রাজপুত্র, পক্ষীরাজ ঘোড়া, এমনকি রাক্ষস-খোক্কসেরা ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে মনের কোন্ অজ্ঞাত অন্ধকার গহ্বরে— ঠিক যেমনিভাবে হারিয়ে গেছে শিশুমনের কোমলতা, সরলতা ও জীবনকে অনাবিলভাবে ভালোবাসার আনন্দ। ছেলেবেলার গল্প শোনার মিঠে দিনগুলি তিক্ত হয়ে উঠেছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আতীব্র হলাহলে।

সে ক্ষতি কি শুধু তাদেরই?

(পুনর্মুদ্রিত)

"তাই দেশে দেশে যত প্রতিরোধ
তারি মাঝে তুলি রক্তের শোধ
নানকিং আর প্যারীর যুদ্ধে
আমরাই সাথে আছি
কাকদ্বীপে ম'রে আমরা আবার
তেলেঙ্গানায় বাঁচি।"

—সলিল চৌধুরী

রাজস্থানের দূর্গে প্রাসাদে মরুতে কয়েকদিন

দেবলীনা পাল
প্রথম বর্ষ (কলা)

মানুষ সুদূরের পিয়াসী, মানুষের দুটো বিপরীত সত্ত্বা আছে। একটা চায় ঘর। ছোট পরিসরে আলস্যের বাঁধনে জড়িয়ে থাকার সহজ সুখ। অন্যটা চায় পথ। যা দেখলাম যা পেলাম তা সামান্য। "দেশে দেশে কতনা নগর, রাজধানী, কত অপরিচিত সিন্ধু-মরু"।

আমরা বেরিয়েছিলাম দুই বছর আগে রাজস্থানের পথে, — যদিও এর পরিকল্পনা হয়েছিল তার এক মাস আগে। তখন থেকেই মাঝে মধ্যে আমি আনমনা হয়ে যেতাম, যখন তখন চোখের সামনে ভেসে উঠতো ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি, আর 'সোনার কেল্লা' সিনেমার 'জটায়ুর' উটে চড়ার দৃশ্য।

৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় সময় আমেদাবাদ এক্সপ্রেসে চড়ে ৬ তারিখ দুপুর বেলা আমেদাবাদ পৌছাই। ভারতের ম্যানচেষ্টার এই আমেদাবাদ, সূতাবস্ত্রের বিখ্যাত স্থান। এখানে এক রাত্রী থাকার পর আমরা আজমীরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পাহাড় ঘেরা সুন্দর আজমীরের আকর্ষণ হল পুষ্কর হ্রদ, সাবিত্রী পাহাড় এবং মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ মাজার-ই-সরিফ। এই আকর্ষণীয় স্থানগুলো দর্শন করার জন্য আমরা দুদিন আজমীরে কাটিয়ে চলে যাই, ইতিহাস প্রসিদ্ধ চিতোরগড়ে। ইতিহাসে আমরা যে চিতোরকে পাই, যার সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য আমার মনের মধ্যে ছিল বর্তমান চিতোরগড়ে তার কিছুই খুঁজে পাইনি। সে যেন এক স্মৃতিবিজরিত ধ্বংসস্তূপ— রাণা, পদ্মিনীর শ্মশানভূমি। এখানেই মাটি, আকাশ, বাতাস যেন মনে করিয়ে দেয় ধাত্রীপান্নার কান্না, মীরাবাঈয়ের দুঃখ ও পদ্মিনীর আত্মত্যাগের কাহিনী। বর্তমান চিতোর মনে করিয়ে দেয় না রাজপুত বীরদের অসির শব্দ। এখানে একরাত থাকার পর আমরা চলে যাই গোলাপী শহর জয়পুরে। ইতিহাসে আমরা যে জয়পুরের প্রাসাদ দুর্গ, হাওয়ামহল ইত্যাদির কথা পড়েছি সেইগুলি নিজের চোখে দেখে দারুন আনন্দ পেয়েছি। জয়পুরে উট আর ময়ূর সর্বত্রই চোখে পড়ে। এমনকি কোথাও কোথাও বাড়ীর কার্নিশেও ময়ূর ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। জয়পুরের মিউজিয়ামে দেখলাম বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত আছে যা আজও জয়পুরের ইতিহাস বহন করছে। এখানে তিনদিন থাকার পর বাসে করে আমরা গিয়েছিলাম উদয়পুরে। এ আর এক সুন্দর শহর। এখানকার লেক-প্রাসাদ দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোন শিল্পীর আঁকা সুন্দর ছবি। এখানকার গাইডদের থেকে জানতে পারি উদয়পুর শহরটা হল 'City of Place' 'City of Fountain' এবং 'City of simple men' প্রথম দুটি কথার সত্যতা বুঝলেও শেষ কথাটি যে কতটা সত্যি তা জানার সুযোগ হয়নি এখানে অল্পদিন থাকার জন্য। এরপর আমরা ট্রেনে করে যাই জয়সলমির। মরুভূমির মধ্যেদিয়ে ট্রেনে করে যাওয়ার যে উত্তেজনা তা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। জয়সলমীরের রুক্ষ সৌন্দর্যের একটা আলাদা স্বাদ, আলাদা টান। এখানে সোনারকেল্লার ভগ্নাবশেষ দেখে চলে যাই মাউন্ট আবু। এখানে দুইদিন থেকে এখানকার অপূর্ব শ্বেত পাথরের মন্দির দিলওয়ারা টেম্পেলের নিখুঁত কারুকাজ দেখে, লেকে বেড়িয়ে এবং আরাবল্লীর উপর থেকে সূর্যাস্তের অসাধারণ দৃশ্য দেখে চলে যাই দ্বারাকায়। গোমতী নদী ও আরব সাগরের সংযোগ স্থলে এই দ্বারকা শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি। দ্বারকা থেকে ভারতের পশ্চিমের শেষপ্রান্ত ওখা হয়ে আমরা বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হই।

রাজস্থানের শিল্প-সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছুই আমাদের চেনা জগতের চেয়ে এতোই অন্যরকম যে আমাদের পদে পদে চমক লাগত। রাজস্থানী মেয়েদের উজ্জ্বল রঙের ঘাঘরা চোলি, গা ভরা গহনা, পুরুষদের মাথায় বিশাল পাগড়ী ও তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া বিরাট গোঁফ সবই ছিল আমাদের কাছে দ্রষ্টব্য বিষয়। রাজস্থান ভ্রমণ আমার কাছে এক স্বপ্নের ভ্রমণ। মনে হয় কবে আবার যাব সেখানে, কবে আবার দেখব সেই সুন্দর স্বপ্নের দেশ।

প্রকৃতির বিচিত্র প্রাণী

নির্মল দে
প্রথম বর্ষ

পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন কিভাবে ঘটল তা আজও এক অনন্ত রহস্য। জীব কিভাবে জীবন যাপন করতে শিখল তাও তমসা আচ্ছন্ন। আসলে আমাদের প্রকৃতি নিজেই রহস্যময়, ভয়ঙ্কর কিন্তু সুন্দর। বিচিত্র তার জীবও।

যাযাবর হাঁসেরা এভারেস্টের ৪৪০০ মি. উঁচুতে উড়তে পারে, তিনি সাগরের জলের ১০০০ মি. নীচে থাকতে পারে যেখানে প্রতি বর্গমিটারে জলের চাপ ১০০ কি.গ্রা.। অভিযোজন-এর মাধ্যমে এরা প্রকৃতির বাধাকে জয় করেছে, জলের এত নীচে যদি কোন মানুষ গ্যাস মুখোস ছাড়া নামে এবং ভুলবশত প্রশ্বাস নেয় তবে তার ফুসফুসে সেই জল ঢুকে ফুসফুসকে ফাটিয়ে দেবে। যদিও এত চাপ কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না। উটপাখির গতিবেগ ১০০ কি.মি/ঘন্টা এবং বাজপাখি উড়তে পারে ২০০ কি.মি./ঘন্টা বেগে যা কিনা রাজধানী এক্সপ্রেসের গতির মত। ..... বিশেষ গঠন, বায়ুথলী, ফুসফুসের কার্য দক্ষতা, বুকের একটি বিশেষ হাড় এবং অবশ্যই ডানা পাখিকে উড়তে এবং যথেষ্ট দ্রুতগতিতে উড়তে সাহায্য করে। পিয়ারজিন ফ্যালকনের গতিবেগ ২০০ কি.মি/ঘন্টা (প্রায়) এবং স্রিফটের বেগ ১৫০ কি.মি/ঘন্টা। ছোট্ট পাখি হামিং বার্ডকে বলা হয় উড়ন্ত রত্ন। সারাদিন খাবারের খোঁজে উড়ে বেড়ায়। একসেকেণ্ডে এক ১৮ থেকে ৭৮ বার ডানা ঝাপটাতে পারে। পানকৌড়ি পাখির দেহের দুপাশে ডানা ছড়িয়ে করে কমিটার উপর থেকে জলে ঝাপিয়ে পড়ে এবং শিকার ধরে।

বৈচিত্র আছে জীবের বাসস্থানেও। বাবুই পাখির বাসা সত্যিই সুন্দর। ঝড়বৃষ্টির থেকে বাঁচবার জন্য বাসাগুলি হয় উল্টানো কুঁজোর মত। বাড়ি তৈরিতে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হল ইঁদুর। এরা মাটির তলায় গর্ত খোঁড়ে। নকল গর্তও আছে যার এক প্রান্ত বন্ধ। সাপকে বোকাবানানোর জন্য এই পরিকল্পনা। পিঁপড়ে তাদের বাসা বানায় কার্ডবোর্ড দিয়ে নানা ধরনের লম্বা বারান্দা ও প্রকোষ্ঠ। অত্যন্ত জটিল গঠন প্রণালী। বোলতা— মুখের লালা ও কাঠের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করে ঘর। পলিবিয়া বোলতা মাটি ও বালি দিয়ে ঘর তৈরি করে। উইপোকার বাসা হয় চুন-বালি-সিমেন্টের মত শক্ত এবং কয়েক মিটার উঁচু। এপিকোটার্সিস উই পোকা নিজ স্থলকে বাসস্থান তৈরিতে ব্যবহার করে।

প্রকৃতিতে সর্ববৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণী নীল তিমি যা প্রায় ৩০মি. লম্বা ও ওজন চল্লিশটি হাতির সমান প্রায় ১৪০ টন। ক্যালিফোর্নিয়ার সিকোইয়া ১০ মি. থেকে ১০০ মি. লম্বা হয়। আবার টিনিড্যাক ছারপোকা আকারে ১ মি.মি. এর কম। রেটিফিয়ারসের ওজন ০.০০০১ গ্রামের কম। গুটি পোকার এক একটি গুটি তিন থেকে চার হাজার মিটার লম্বা সিল্কের সূতা দ্বারা তৈরি। নিরক্ষীয় বা মেরুপ্রদেশে এবং মেরু অঞ্চলে প্রাণীদের রঙ হয় সাদা বা হাল্কা রঙ। এবং অন্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে দেখা যায় বিচিত্র রঙের প্রাণী। প্রকৃতি নিজেই তার প্রাণীদের বিভিন্ন রঙে সাজিয়ে তুলেছে।

টুনা মাছেরা সাঁতার কাটতে পারে ৪০ ঘন্টা/মাইল গতিতে। অর্থাৎ আনবিক সাবমেরিনের থেকেও দ্রুতগতিতে। ছোট সোনালি প্লোভার পাখি প্রতিবছর শীতকালে আলাস্কা থেকে কানাডা প্রায় ৩৫০০ কি.মি পথ একনাগাড়ে উড়তে পারে। আর্কটিক টার্ন পাখি অদ্ভুত এক নৌসংকেত অনুসরণ করে প্রতি বছর যায় উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে প্রায় ২৯০০০ কি.মি পথ।

কিছু কীটপতঙ্গ আছে যারা প্রতি সেকেণ্ডে হাজারবার ডানা নাড়তে পারে। বাদুরেরা একপ্রকার আলট্রাসোনিক তরঙ্গ তৈরি করতে পারে যা কিছুতে বাধা পেয়ে পুনরায় দেহে ফিরে আসে এবং বাদুর চোখে না দেখতে পেলেও মুহূর্তের মধ্যে হিসাব করে নেয় কতদূরে সেই বাধা এবং এই জন্যই বাদুর শিকার ধরতে সক্ষম। কিছু সাপ আছে যারা

শিকারের চোখে বিষ ছুড়ে শিকারকে অন্ধ করে দেয়। আবার কিছু সাপ শিকারের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে ইনফ্রায়েড রশ্মি ব্যবহার করে। কয়েক প্রকার মাছ নদীর কর্দমাক্ত স্থান নির্ণয়ে ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক চৌম্বকশক্তি।

মানুষ তার প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে অণু থেকে শক্তি বের করতে পারে। ইহা প্রচুর খরচ সাপেক্ষ। এর ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থসমূহ পৃথিবীকে দুষিত করে। আবার যে সৌরশক্তি পৃথিবীতে এসে পড়ে তার মাত্র ২ শতাংশ শক্তি উদ্ভিদ গ্রহণ করে নিজ দেহে রাসায়নিক শক্তি রূপে আবদ্ধ রাখে। এই শক্তির জোরে বিশ্বে যাবতীয় শিল্প, কারখানা, ট্রেন, বিমান চলছে। বিদ্যুৎ জ্বলছে। কিন্তু মরুভূমি অঞ্চলে প্রতি বর্গ মিটারে ২৫০ ওয়াট শক্তি এসে পড়ে। এত বিরাট সৌরশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন ও চাকা অবিষ্কার হল প্রগতির স্বাক্ষর। চাকার আবিষ্কার ৫০০০ বছর আগে সুমেরীয় সভ্যতায়। তবে যারা সভ্যতা যে সব বিশাল শহর তৈরি করেছিল ইউকাটানে— তাতে চাকার কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। টিটিকাকা হ্রদের কাছেই রয়েছে নিপুন হাতে কাটা ১৩২ টন ওজনের পাথর। নাম পুমা পুংকু। এত ভারী পাথর আনা হয়েছে ১২ কিমি রাস্তা। স্থানটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে চার হাজার মিটার উঁচুতে। এত বড় পাথর আনতে কত বড় গাড়ি দরকার হয়েছিল? গাড়িটা এত বড় যে চল্লিশটা হাতি আর ১৩০টা যাত্রীবাহী গাড়ী তার মধ্যে ধরতে পারে। কিন্তু সে যুগে চাকা আবিষ্কার হয়নি ..... এত বড় পাথর কারা, কিভাবে আনল তাও এক রহস্য।

এই রকম আশ্চর্য হতে হয় মিশরের পিরামিড দেখে, সেই যুগে কিভাবে অত বড় পাথরকে উপরে তোলা হত তাও আশ্চর্য।

এই রকমই প্রকৃতির বিচিত্র যাদুঘরে রয়েছে বিভিন্ন রকম বিচিত্র জীব ও তাদের বিচিত্র কর্ম।

★ ★ ★

বিচার

শ্রী রাকেশ মুখোপাধ্যায়
প্রথম বর্ষ (কলা)

শুভ কিছুদিন হল M.A. পাশ করেছে। ওর বিষয় ছিল বাংলা। এই নিয়ে প্রায় দুমাস হয়ে গেল, বেকারত্ব কি জিনিস এবার সে রীতিমত অনুভব করতে শুরু করেছে। বাড়িতে সরাসরি কেউ কিছু না বললেও, আকারে ইঙ্গিতে বৌদিরা ঠিকই বুঝিয়ে দেয় যে সে সংসারের এক বোঝা। ফলে একটা যেকোন চাকরি তার খুবই দরকার। এইজন্য শুভ প্রতিদিন দুটো করে কাগজ নেয় ও কর্মখালি গুলো মন দিয়ে পড়ে। সেদিন রবিবার, কর্মখালিতে হঠাৎ শুভর চোখ পড়ে গেল একটি বিজ্ঞাপনের দিকে। বারাসাতের এক অনামী স্কুল বাংলার জন্য দক্ষ শিক্ষক চাইছে, সত্বর যোগাযোগ করতে

বলেছে। শুভ ঠিক করে ফেলল পরের দিনই সে গিয়ে যোগাযোগ করবে। যথারীতি, সোমবার সকাল বেলা শুভ সেই স্কুলের হেডমাষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তিনি তাকে ইন্টারভিউয়ের দিন যেতে বলেন।

এক সপ্তাহ কেটে যায়, ধীরে ধীরে ইন্টারভিউয়ের দিন ঘনিয়ে আসে। অবশেষে সেই ইন্টারভিউয়ের দিনে শুভ যোগ্য শিক্ষক হিসাবে মনোনিত হয় এবং তাকে বলা হয় সে যেন দুদিন পর থেকেই তার চাকরীতে যোগ দেয়। সেটা ছিল শুভর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। সে নিজেও চাকরি করবে, সকলের মত রোজগার করবে, এই অনুভূতি তাকে এক অদ্ভুত তৃপ্তি দিতে থাকে প্রতিমুহূর্তে। দুদিন পরে শুভ প্রথম তার চাকুরী জীবন শুরু করে। কর্মস্থল হিসাবে স্কুলটিকে মোটামুটি ভালই লাগে। সব শিক্ষকরাই খুব বন্ধুসুলভ এবং মিশুকে।

কিন্তু শুভর সবার থেকে ভালো লাগে হেডমাষ্টার মশাইকে। ঐরকম সংযমী, গম্ভীর, ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ সে তার নিজের জীবনে খুব কমই দেখেছে। ফলে প্রথমদিন থেকেই তাঁর প্রতি শুভর এক গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। প্রথমদিকে রুটিনে শুভর জন্য ছিল সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর রিজার্ভ ক্লাস। সকল ছাত্রই খুব ভদ্র ও শান্ত। তবে শুভ শুনেছে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা খুবই বেয়াদপ ও অসভ্য। দুসপ্তাহ পরে যখন নতুন রুটিন বের হয়, সেখানে শুভকে দ্বাদশশ্রেণীর বাংলাক্লাস দেওয়া হয়। শুভ প্রথমে শুনে খুশি হয়েছিল কিন্তু পরে তার সহকর্মী শিক্ষকগণ যখন তাকে ছাত্রদের সম্বন্ধে সাবধান করে তখন সে একটু বিচলিতই হয়ে পড়ে। কিন্তু এনিয়ে বেশী মাথা না ঘামিয়ে সে তার নিজের কাজে মনোনিবেশ করে।

পরের দিন, তার প্রথম দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস। বারোটা ত্রিশ মিনিটে ক্লাস শুরু। শুভ বারোটা-চল্লিশ নাগাদ দরজার সামনে এসে থমকে গেল। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে ক্লাসের ভিতর প্রবেশ করে।

'মুরগী এসে গেছে'— শুভ এতটা অভদ্রতা আশা করেনি কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

'এত দেরীযে, কোথায় ছিলেন?'— একটি ছেলে প্রশ্ন করে ওঠে। শুভ কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছে। চুপ করে থাকে।

'কিরে বাবা! বোবা নাকি?'

শুভ লক্ষ্য করে প্রশ্নগুলো বেশীরভাগই একটি ছেলের কাছ থেকে আসছে। বোধহয় সেই দলনেতা। এবার শুভ ধমকায়— 'আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করতে আসিনি।'—

ছেলেটা একটু দমে যায়।

'আমি তোমাদের বাংলা পড়াব। আর আজকে যে গল্পটা পড়াব...' এই অবধি বলার পর সেই ছেলেটি বলে ওঠে

'স্যার আপনার নামটা কি?'

'শুভময় সেন'—

'কি রকম ক্যাবলা ক্যাবলা, না স্যার?'

'চুপ কর, একদম কথা বলবেনা। ক্লাস শেষ হবার পর আমি তোমাদের দেখছি'— এইবলে শুভ পড়াতে শুরু করে। ছেলেটিও থিতেয়ে পড়ে। কিন্তু সমস্ত ক্লাস সে অমনোযোগী থাকে এবং হাসাহাসি করে যা শুভর কাছে অসস্তিকর হয়ে ওঠে। ক্লাস শেষ করে শুভ যখন দরজার কাছে বেরোতে যাচ্ছে, হঠাৎ পিছনথেকে আওয়াজ আসে—

'বল হরি হরিবোল, শুভময়কে খাটে তোল'—

চকিতে মুখ ঘুরিয়ে শুভ ছেলেটিকে দেখতে পায়। তার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে, চিবুক শক্ত হয়ে যায়। ডান হাত দিয়ে সপাটে তার গালে এক চড় মারে তারপর আবার আর একটা বাঁহাত দিয়ে। কলার ধরে মাটিতে ফেলে ছেলেটিকে টানতে টানতে নিয়ে যায় হেডমাষ্টারের ঘরে। ঘরের সামনে তখন ছাত্রশিক্ষকের ভিড়ে জমজমাট। ছেলেটিকে স্যারের টেবিলের সামনে রেখে শুভ সবকথা খুলে বলে। হেডস্যার নিমেষে শক্ত হয়ে গেলেন এবং রক্তবর্ণ চোখে ছেলেটির দিকে তাকাতে থাকেন।

শুভ বলে, 'স্যার, এইসব ছেলের জন্য স্কুল নরক হয়ে উঠেছে, আমাকে বলেছে সেটা বড় কথা নয়, পরে ও আরও অন্য শিক্ষকদের বলবে। এদের বাবা মা এদেরকে এই সব শিক্ষা দিয়ে স্কুলে পাঠায়। স্যার, আপনাকে এর একটা বিহিত করতেই হবে।'

হেডস্যারের তখন বাকরুদ্ধ অবস্থা। তিনি চোখের ইশারায় শুভকে বুঝিয়ে দিলেন সে যেন চলে যায় এবং তিনি ছেলেটিকে দেখছেন তার কি করা যায়। শুভ যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসছে তখন ছেলেটি বলে ওঠে, স্যার, আমিও আপনাকে দেখে নেব।'— শুভ আবার তার দিকে তেড়ে যেতেই সকল ছাত্ররা মিলে তাকে ধরে নেয়।

এরপর অনেকক্ষণ কেটে যায়। সেই ঘটনার পর শুভ স্কুল থেকে চলে আসে এবং বাড়ি ফেরে তখন রাত আটটা বেজে গেছে। ঘরে ঢুকেই দেখে তার সহকর্মী শিক্ষক সুধীন হালদার বসে আছেন।

শুভ একেবারে অপ্রস্তুত— "আরে, সুধীনদা! আপনি এখানে?"—

সুধীনবাবু বললেন "শুভময়বাবু কাজটা কি আপনি ভালো করলেন?"

'কি করব বলুন? আপনি কি বলতে চান এই অপমান আমাকে মুখবুজে সহ্য করতে হবে?"

'আহা তা কেন! আপনি কি জানেন অনিমেষ কার ছেলে?'—

'কার ছেলে তা আমার জানার দরকার নেই, হবে কোন বিশাল বড় লোকের ছেলে। আমি পরোয়া করি না। আমার আগেপিছে কেউ নেই।'

সুধীনবাবু বলে উঠেন 'আরে, তা হলে তো এত কথাই ছিল না, কথা হচ্ছে যে অনিমেষ হল আমাদের হেডস্যারের ছেলে।'

'অ্যাঁ! বলেন কি! আপনারা তো কেউ আমাকে বলেন নি।'—

'কোথায় সময় পেলাম বলুন! আপনি তো এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। আসল কথা হচ্ছে আমাদের হেডস্যার অত্যন্ত আত্মসম্মানী। ছেলেদের সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে কিছু হলেই স্যারের জ্বর এসে যেত এবং প্রেশার বেড়ে যেত। ওনার ঐ একটি সন্তান, একেবারে গোল্লায় গেছে। ওকে নিয়ে ওনার খুব চিন্তা। এই ঘটনার পর ওকে সবাই এত ধিক্কার দিচ্ছে, আমার বড় চিন্তা হচ্ছে, শুভময়বাবু...

শুভও এবার চিন্তায় পড়ল এত কিছু জানলে সে ঘটনাকে ক্লাসেই শেষ করে দিত। তারপর সুধীনবাবুর দিকে ফিরে বলল, 'আচ্ছা, এখান থেকে হেডস্যারের বাড়ি কতদূর?"—

'বেশী দূর নয়, এই সামনেই, বাসে মিনিট পনেরো-কুড়ি সময় লাগে।'

'তাহলে চলুন একবার ঘুরে আসি। স্যার ও অনিমেষ দুজনের সঙ্গেই মিটমাট করে নেব।'

'তাই চলুন। স্কুলের ভিতর বাজে ব্যাপার ভালো নয়।'

এই বলে দুজনে বেরিয়ে পড়লেন হেডস্যারের বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়ির কাছাকাছি এসে দুজনে থমকে গেলেন। প্রচুর লোক, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, আবহাওয়া থমথমে।

শুভ একজন পুলিশ অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল, 'স্যার এখানে কি হয়েছে? এত লোক কেন?'—

অফিসার বললেন, 'আরে, এখনো আপনারা কিছু জানেন না? বারাসাতের স্কুলের হেডমাষ্টার অনাথরঞ্জন মল্লিক নিজের একমাত্র ছেলেকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে নিজেও আত্মঘাতী হয়েছেন।'

শুভ নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছেনা। স্তব্ধ, বিমূঢ়ভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল। আকাশে সেদিন অজস্র তারা ঝলমল করছিল। আকাশের দিকে তাকিয়ে শুভর মনে হল তারারা যেন হাসছে।

★ ★ ★

সাম্রাজ্যবাদী হলিউড বনাম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব-সিনেমা

সৌভিক গোস্বামী
দ্বিতীয় বর্ষ (কলা)

লেখাটির শীর্ষনাম দেখে মনে হয়েছে, যেন এ এক যুদ্ধের প্রস্তুতি। মনে হওয়াটা ভুল কিছু না— সত্যিই এ এক নিরস্ত্র, রক্তপাতহীন যুদ্ধ, যা করে চলেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব সিনেমা, হলিউডের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। 'সাম্রাজ্যবাদী' কথাটি খুব সচেতনতার সঙ্গে ব্যবহার করলাম।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চূড়ান্ত সাফল্যে বিভোর পৃথিবীর এখন কিন্তু গভীর অসুখ— আর এই অসুখকে ক্যানসারের মত ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ধনবাদী দেশটি। একবিংশ শতকের এ এক চূড়ান্ত সত্যভাষণ। সিনেমার সাথে এইসব কথার প্রাসঙ্গিকতা ও সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীরভাবে যুক্ত। রাজনীতি থেকে সিনেমাকে যারা সরিয়ে রাখেন অথবা সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করেন, তাদের আমি ধিক্কার জানাই। সাম্রাজ্যবাদী হলিউড বনাম বিশ্ব সিনেমার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে লড়াই সে লড়াই প্রকৃত অর্থেই এক রাজনৈতিক লড়াই— এক বৃহত্তম রাজনৈতিক অভিঘাত।

বিশ্ব সিনেমা তার বিত্তশালী প্রতিপক্ষের সাথে ক্রমাগত লড়াই করতে করতে যখন প্রায় ক্লান্ত, তখনই "মিডাস টাচ্" এর মত নতুন করে লড়াইয়ের সূচনা করলেন, সেই যুদ্ধেরই অন্যতম সৈনিক লাতিন আমেরিকার দেশ আর্জেন্টিনার চলচ্চিত্রকার এলিসিও সুবিয়েলা। সুবিয়েলা স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন— লাতিন আমেরিকা, ইউরোপ বা এশিয়া তথা বিশ্ব সিনেমার চিরতরে শত্রু আগ্রাসী হলিউডি সিনেমা। হলিউডের বিরুদ্ধে সুবিয়েলার এই স্পষ্ট জেহাদ আমাকে মনে করিয়ে দেয় জঁ রেনোয়ার কথা। ১৯৪৯-এ কলকাতায় 'রিভার' ছবির শুটিং করতে এলেন হলিউডের বিখ্যাত ফরাসী চলচ্চিত্রকার জঁ রেনোয়া। রেনোয়া'র কলকাতা আগমন তৎকালীন প্রচুর সংখ্যক চলচ্চিত্রমনস্ক তরুণকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, যাঁদের অন্যতম হলেন সত্যজিৎ রায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সত্যজিৎ রায়ে'র চলচ্চিত্রমনস্কতার ভিত্তিস্থাপন করেছিল হলিউড। কিন্তু সেই সত্যজিৎ রায়'ও "Calcutta Film Society" ১৯৪৮-এ র প্রতিষ্ঠা এবং সেই সূত্রে ইউরোপ ও বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েত চলচ্চিত্রের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে হলিউড সিনেমার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসেন। চলচ্চিত্রের এক নতুন দিশার সন্ধানে ছুটেছিলেন রেনোয়া'র কাছে। রেনোয়া একবার হলিউড সিনেমা সম্বন্ধে বলেছিলেন—

"Ah, the American film... its a bad influence". প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে সুবিয়েলার কণ্ঠেও রেনোয়ার কথারই প্রতিধ্বনি খুঁজে পেলাম।

চলচ্চিত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে চতুর ব্যবসায়ীরা বুঝেছিলেন যে, আগামী শতাব্দীর এ-এক শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়িক মাধ্যম। সিনেমাকে বেঁধে ফেলা হল এক বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবসায়ে, যার নাম হলিউড। এই হল সুচতুর পুঁজিবাদী রাজনীতি। যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে লেনিন নির্দেশ দিয়েছিলেন, সিনেমাকে পুঁজিবাদ তথা বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অন্যতম হাতিয়ার করে তুলতে। লেনিনের এই সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ পেলাম বিপ্লব পরবর্তী সোভিয়েত সিনেমার সুবর্ণ যুগ। পেলাম হলিউডের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা সংগঠিত আন্দোলন— স্বতন্ত্র সিনেমার ভাষা ও নন্দন তত্ত্ব। অবশ্য জার্মান 'এক্সপ্রেসনিজম', ফরাসী 'ইম্প্রেসনিজম' চলচ্চিত্র আন্দোলন নিরন্তর হলিউডের সাথে লড়াই চালিয়েছে। এমনকি আমেরিকাতে বসেও অরসন ওয়েলস হলিউডকে উপেক্ষা করে তৈরী করেছেন যুগান্তকারী ছবি 'সিটিজেন কেন'।

ইউরোপে চলচ্চিত্রের শিল্পতত্ত্বের বিচারে গত শতাব্দীর মধ্য তিরিশ থেকেই এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা গেল। শুরু হল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন। চলচ্চিত্র সমালোচক জর্জ শার্দুল, অঁদ্রে বাঁজা সিনেমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ের প্রেক্ষাপটে এক রচম সম্ভাবনাময় শিল্পমাধ্যম রূপে। সেখান থেকেই জন্ম নিল একের পর এক চলচ্চিত্র আন্দোলন। বিশ্ব সিনেমার আঙিনায় আবির্ভূত হল

লাতিন আমেরিকা, এশিয়া বা আফ্রিকার সামাজিক তথা রাজনৈতিক অভিঘাতে সৃষ্টি চলচ্চিত্র।

এবারে চলল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বিষাক্ত প্রলোভন দেখানোর খেলা। উদারীকরণের হাওয়া বইয়ে বহু আকাঙ্খার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হল। তামাম পূর্ব ইউরোপ থেকে বিদায় নিল সমাজতন্ত্র। সাম্রাজবাদী মার্কিন পুঁজিবাদ বিশ্বায়নের মন্ত্র বলে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুকেই পদানত করে ফেলল এবং অবশ্যই সিনেমাকেও। হলিউডকে নতুন মোড়কে সাজিয়ে গিলিয়ে দেওয়া হল তামাম বিশ্বকে। অভিভাবকের মত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘোষণা করেছে বিশ্বব্যাপী অন্য সিনেমাকে মুছে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত কর আগ্রাসী হলিউডকে— সিনেমার একমাত্র রেফারেন্স হোক হলিউড।

মনে বল পাই, যখন সুবিয়েলা হলিউড সিনেমাকে শত্রু বলে চিহ্নিত করে আর লাতিন আমেরিকার এই অসামান্য চলচিত্রকারকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছা করে আপনার এই লড়াইয়ের সঙ্গী আমরাও। নিপাত যাক সাম্রাজ্যবাদী হলিউড সিনেমা, বিরাজ করুক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিশ্ব সিনেমা।

★ ★ ★

টুকরো হাসি

জয়ন্ত সাহা

(বিজ্ঞান)

মা— বোতলের গলাটা ভাঙলো কি করে রে খুকু?
খুকু— মনে হয় কাল খুব বেশী করে দৈ কিংবা কৈ খেয়েছে।

পণ্ডিত মশাই— দুইজন দেব দেবীর নাম বলো তো ভোম্বল।
ভোম্বল— কপিলদেব এবং শ্রীদেবী স্যার!

মা— বিজন, মারামারি কোরো না। মারামারি করা অন্যায়।
বিজন— না মা, আমি মারামারি করছি না। রঞ্জন জানে না তাই ওকে শিখিয়ে দিচ্ছি।

মাষ্টারমশাই— ভোঁদু বলোতো, কাল কয় প্রকার?
ভোঁদু— (মাথা চুলকে) দু প্রকার স্যার।
মাষ্টার মশাই— (রেগে) কি কি?
ভোঁদু— সকাল আর বিকাল।

একটি লোক তার বন্ধুকে খালি পেটে কটি রসগোল্লা খেতে পারবে জিজ্ঞেস করাতে সেই বন্ধুটি চল্লিশটা বলল। তখন ঐ লোকটি বলল যে, একটা খেলেই তো পেট আর খালি থাকবে না। শুনে তার বন্ধুটি বলল, 'বেশ মজার কথা তো।'

তারপর বন্ধুটি বাড়ি এসে তার ভাইকে জিজ্ঞেস করল, "মুন্না, তুই খালি পেটে কটা রসগোল্লা খেতে পারবি?" ভাইটি দশটা বলাতে বন্ধুটি বলল, 'ইস' তুই যদি চল্লিশটা বলতি, তবে একটা মজার কথা বলতাম।'

বন্ধু

দীপ্তা গোস্বামী
প্রথম বর্ষ (কলা)

জয়ন্তর কলেজে পৌছাতে আজ দেরি হয়ে গেল। ক্লাসে প্রফেসর পড়াতে শুরু করে দিয়েছেন, দরজা বন্ধ, তাই সে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। এমন সময়ে দেখতে পেলো তার প্রানের বন্ধু সুভাষ আসছে। ওরা দুজনেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। দুজনেরই প্রথম বর্ষ। কলেজে ওরা নতুন এসেছে, কিন্তু আসার কিছু দিনের মধ্যেই ওদের মধ্যে এত গভীর বন্ধুত্ব হয়েছে, যে ওরা একে অপরকে বেশীক্ষণ না দেখে থাকতে পারে না। সুভাষ কাছে এসে জয়ন্তকে বললো 'কিরে। কখন এলি?' জয়ন্ত বললে 'এইমাত্র। এখন তো ক্লাস করতে পারবো না, তার চেয়ে চল দাঁড়িয়ে গল্প করি'। এইভাবে কিছুক্ষণ গল্প করার পর যখন একটা পিরিয়ড শেষ হল তখন ওরা যে যার ক্লাসের দিকে চলে গেল, তার যাবার আগে সুভাষ জয়ন্তকে বললে ছুটির পর তার জন্য অপেক্ষা করতে, ওরা একসাথে বাসস্ট্যান্ড অবধি যাবে। ক্লাস ছুটির পর সুভাষ বাইরে এসে জয়ন্তকে দেখতে পেলো না। ওর খুব দুঃখ লাগলো। পরদিন কলেজে এসে ও দেখলো জয়ন্ত নতুন একটি মেয়ে বন্ধুর সাথে খুব গল্প করছে। সুভাষ ওদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল, কিন্তু জয়ন্ত গল্পে এতই মশগুল যে সুভাষের দিকে ফিরেও তাকাল না। তারপরদিনও সুভাষ জয়ন্তকে দেখলো ঐ মেয়েটির সাথে। কিন্তু তার লজ্জা করছিল জয়ন্তকে ডাকতে। কলেজ ছুটির পর জয়ন্তকে একটুর জন্য একা পেয়ে সুভাষ বললো 'জয়ন্ত আজ একসাথে যাবি?' জয়ন্ত বললো না। তুই চলে যা, আমার দেরি হবে।' এরপর থেকে সুভাষ দেখলো জয়ন্ত আর তার সাথে তেমন কথাও বলছে না, তার কাছেও আসছে না। জয়ন্তর সাথে কথা বলতে গেলেও সে একটা দুটো কথা বলেই সরে যাচ্ছে। জয়ন্তর এই ব্যবহার সুভাষের মনে একটা একাকীত্বের সৃষ্টি করলো। সে ভাবলো কেন জয়ন্ত আমার সাথে এমন ব্যবহার করলো। আমার বন্ধুত্ব, ভালোবাসার কি কোন দাম নেই। আমি কি এতদিন ভুল মানুষকে নিজের ভালোবাসা দিলাম। তাই যদি হয় তবে আমি ওর জীবন থেকে সরে যাবো।

পরদিন কলেজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলো। সুভাষ বেরোবে এমন সময়ে জয়ন্ত এসে বললে 'চল সুভাষ আমরা একসাথে যাই'। সুভাষ বললো 'এখন আর আমাদের পক্ষে একসাথে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি যখন তোকে ডেকেছিলাম তখন তুই আমার সাথে আসিসনি, আমার বন্ধুত্বের কি কোন দাম নেই তোর কাছে'? জয়ন্ত বললে 'আমি সত্যি-ই অত্যন্ত ভুল করে ফেলেছিলাম। তোর সরল বন্ধুত্বকে উপেক্ষা করে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যা কাছের তাকে ছেড়ে দূরের অধরার দিকে ছুটেছিলাম। কিন্তু এখন আমার বোধোদয় হয়েছে। তুই আমায় যা শাস্তি দিতে চাস দে, কিন্তু আমায় ছেড়ে চলে যাস না। তুই আমার জীবন থেকে চলে গেলে আমি নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বো আর সেই অবস্থায় আমি থাকতে পারবো না। তুই আমার কথাটা রাখ।' বলতে বলতে জয়ন্তর চোখ ছলছল করে উঠলো। সুভাষ বললো 'জয়ন্ত, আমি তোকে ভুল বুঝেছিলাম, তুই সত্যিই খুব ভালো। তোর এই যে আত্মজাগরণ হয়েছে তাতেই আমি খুশি তোকে ছেড়ে আমি কি কোথাও যেতে পারি? আমি সবসময়েই তোর সাথে সুদিনে-দুর্দিনে থাকবো। আমাদের বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট থাকবে'। কথা বলতে বলতে আনন্দে সুভাষের চোখেও জল চলে এল। তারা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলো। বাইরের মেঘলা আকাশও এই দুই নবীন বিরহী হৃদয়ের মিলনে আনন্দের অশ্রু বর্ষন করতে লাগলো।

★ ★ ★

লালু ডুরে শাড়ি

মৌসুমী দেবনাথ
দ্বিতীয় বর্ষ (কলা)

গ্রামের নাম রাজারামপুর। মেদনীপুর জেলার এই অখ্যাত গ্রামেই স্ত্রী, কন্যা ও দুই পুত্রের সঙ্গে বাস চন্দ্রকান্তের। ছোট্ট একটুকরো জমির ওপর আরো ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে বাস চন্দ্রকান্তের। এই ছোট্ট কুঁড়েঘরটি ছাড়াও চন্দ্রকান্তের আছে একটি ভ্যান। সেই ভ্যানে সে থানার মরা বয়। স্ত্রী মালতী পাতা কুড়োয় ও দুইঘরে ঝি এর কাজ করে। খুবই অভাবের সংসার। তবুও তাদের সুখেই দিন চলে যায়। এমন সময় বাপ মায়ের কোল আলো করে লক্ষ্মী পূর্ণিমার দিনে জন্ম হল এক লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের। চন্দ্রকান্ত, মালতী খুশিতে ফেটে পড়ল। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিনে জন্ম বলে চন্দ্রকান্ত মেয়ের নাম দিল লক্ষ্মী। পরে চন্দ্রকান্তের আরো দুই ছেলের জন্ম হল, কিন্তু লক্ষ্মীই চন্দ্রকান্তের চোখের মণি। তার বড় আদরের ধন। সকালে ঘুম থেকে উঠে সবার প্রথমে মেয়ের মুখ দেখে চন্দ্রকান্ত। মেয়ের মুখ না দেখলে নাকি তার দিন খারাপ যায়। বাবার যেমন মেয়ে অন্ত প্রাণ, মেয়েরও তেমনি বাপ অন্তপ্রাণ। বাবার স্নানের জল তোলা, শীতের দিনে বাবার গরম জল করা, বাবার পাকা চুল বাছা সবই লক্ষ্মীর কাজ। চন্দ্রকান্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবে তোর রাজার ঘরে জন্মান উচিত আছিল। ভগবানে তোর ভুল কইর‍্যা আমার ঘরে পাঠাইছে। চন্দ্রকান্ত বিস্ময়ে মেয়েকে বলে "একদিন তুই রাজরাণি হইবি"। লক্ষ্মী লজ্জা পায়। লক্ষ্মী কোনদিন বাবার কাছে কিছু চায় নি। বাবা কিছু দিতে চাইলে সে বলে, "আমার কিছু লাগব না। আমার অনেক আছে। বড় ভাইডার একটা আস্ত জামা নাই। ছোড ভাইডার একডা প্যান তাও ছিইড়া গেছে, তুমি বরং ওগোরেই কিইন্যা দাও।"

কিন্তু একদিন কি হল কে জানে, লক্ষ্মী বাবার মাথায় পাকাচুল বাছতে বাছতে অনেক দ্বিধার পর বলল— 'বাবা আমারে একখান লাল ডুরে শাড়ি কিইন্যা দিবা', অবাক হয়ে যায় চন্দ্রকান্ত মুখে তার কথা সরে না। একি সেই মেয়ে। যে কোনদিন কিছু চায়নি। চন্দ্রকান্ত বুঝতে পারে যে, মেয়ে বড় হয়েছে, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্মী বাবার এই তাকানো দেখে লজ্জা পেয়ে দৌড়ে পালায় ঘরে। সে বুঝতে পারে না বাবাকে সে কি এমন বলেছে যে বাবা ওভাবে তাকিয়েছিল। লজ্জায় সে দুদিন বাবার সামনেই আসতে পারে না। কিন্তু চন্দ্রকান্ত মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজ করতে থাকে। কিন্তু মনের মত পাত্র মেলে না। এ যে তার একমাত্র মেয়ে লক্ষ্মী, তার ঘরের লক্ষ্মী, তাকে কি যেখানে সেখানে দেওয়া যায়। অবশেষে অনেক কষ্টে পাত্র মিলল। পাত্র দেবীপুরের শশধরের একমাত্র সন্তান মানিক। রাজারামপুরের দুগ্রাম পরেই দেবীপুর। এক হাজার টাকা পন। অবশেষে সেই দিন এল। চন্দ্রকান্ত অনেক কষ্টে, অনেক ধার দেনা করে ৬০০ টাকা জোগাড় করল। বাকি ৪০০ টাকা সে বিয়ের পর দেবে। অবশেষে পাত্রপক্ষ তা মেনে নিল এবং ধারে বিয়ে সম্পন্ন হল। লক্ষ্মী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

লক্ষ্মীকে ছাড়া চন্দ্রকান্তের ঘরে মন বসে না, কোন কিছু ভালো লাগে না। মেয়ের প্রথম চাওয়ার কথা মনে পড়লে তার মন বিষাদ হয়ে যায়। অবশেষে সে প্রতিজ্ঞা করে যেদিন মেয়ের জন্য লাল ডুরে শাড়ি কিনতে পারবে সেদিনই মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাবে, অন্যথা নয়। অনেক দিন থানায় ডাক পড়ে না। কেউ মারা না গেলে তার থানায় ডাক পড়বে কিভাবে। চন্দ্রকান্ত ভাবে এখন কেউ মারাও যায় না। মারা গেলে কিছু টাকা পাওয়া যেত। অবশেষে একদিন খবর আসে বড়বাবু তাকে ডাকছেন। দেবীপুরে একজন আত্মহত্যা করেছে। তার ডেডবডি আনার ঠিকানা দেখে মনে পড়ে ওইখানেই তো তার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। চন্দ্রকান্ত ভাবে মরাবাড়িতে গিয়ে কাজ সেরে তারপর মেয়ের বাড়ি যাবে। চন্দ্রকান্ত অনেক সুখের কথা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলে। যেতে যেতে সে নানারকম চাপা গুঞ্জন শুনতে পায়। কেউ বলে, 'মরে বেঁচেছে। যা অত্যাচার করত কেউ বলে, 'মরেছে ছাই মেরে টাঙিয়ে রেখেছে', কেউ বলে, এত লক্ষ্মীমন্ত মেয়েকে শুধু কটা পনের টাকার জন্য মেরে দিল"। এত গুঞ্জনের মধ্য চন্দ্রকান্ত পৌঁছোয়, ভীড় ঠেলে সে ডেড বডির দিকে এগোয়। মেয়ের প্রথম চাওয়া সে পূরণ করতে পারেনি। কিন্তু একি! এ কার মৃত শরীর! এ কি করে সম্ভব। সে ভুল দেখছে নাতো। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে চন্দ্রকান্তের। হাতে রাখা শাড়িটি চেপে ধরে মৃত শরীরটির গায়ে। সে পারল না, তার মেয়ের প্রথম ও শেষ চাওয়া পূরণ করতে।

অভাগিনী

অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় বর্ষ

ময়নাপুর গ্রাম। বহু পুরোনো একটি সুন্দর ছোট গ্রাম— সেই গ্রামকে ঘিরে প্রকৃতির সঙ্গে গ্রামের বাসিন্দাদের এক বহু পুরোনো সম্পর্ক ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সে সম্পর্ক মায়া ও মমতার। সে গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে একটা ছোট সরু নদী— মঞ্জুসা। তার জল, কাঁচের মতো স্বচ্ছ। জলের গভীরতা নামমাত্র, নুড়ি-পাথর স্পষ্ট দেখা যায় সেই পরিষ্কার জলের মধ্যে দিয়ে। নদীটি কিছুদুর গিয়ে মাটিতেই মিলিয়ে গেছে, এবং যেখানে মিলিয়েছে, সেখানে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে চওড়া হয়েই মিলিয়েছে। ঠিক সেই জায়গাটিতেই একটু ধার করে, রয়েছে এক বহু পুরোনো মন্দির। সেখানে লোকের যাতায়াত খুবই কম, এমনকি মন্দিরের কোন পূজারীও নেই। মন্দিরটি এতোই পুরোনো যে, তার ইঁট ও পাথর জর্জরিত সারা গা ময় জড়িয়ে রয়েছে বটগাছের শেকড়। কোন কোন শেকড় আবার মন্দির ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকেছে। কোনটি যে মন্দিরের ফাটল বা কোনটি যে শেকড় তার বোঝার উপায় নেই। মন্দিরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে বিশাল গাছ-গাছালি, ঘন ঝোপ-ঝাড়। চারিদিকের পরিবেশে যেন ফুটে রয়েছে এক বুনো সৌন্দর্য্য।

ময়নাপুর গ্রামের দু-একজন বাসিন্দা বোধহয় মন্দিরটিতে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে একজন হলো মণীষা। মণীষা, একজন ৩২-৩৩ বছরের গ্রাম্য বধূ। আজ থেকে প্রায় ১৪ বছর আগে তার বিয়ে হয়েছে। শ্বশুর বিপ্লববাবু ও শাশুড়ী বিন্দুকে নিয়ে সে ঘর করে। বিয়ের পরের দিনই তার স্বামী বিমল, তাকে ছেড়ে চলে যায়। কোথায় যায়, কেনই বা যায় তার খবর কেউ জানে না। বিমল আদৌ বেঁচে আছে কিনা, তাও কেউ জানে না। গ্রামের অনেকেই অনেক কিছু বলাবলি করে। কেউ বলে, "কে জানে কোন ছুঁড়িকে পছন্দ ছিল, বাপ জোর করে বিয়ে দিয়েছিল কিনা, তাই হয়তো ছেড়ে চলে গেছলো।" আবার কেউ কেউ বলে, "বাপের কিছু নগদ টাকা পয়সা ও মায়ের সোনার গয়না নিয়ে ছোঁড়া পালিয়েছে ; কল্‌কেতেয় ব্যবসা করবে কিনা।" অনেকে আবার বলে, "হাঁ গো আমি দেখেছি, রাতে বিমলকে নিশিতে ডেকে নিয়ে গেছে।" যে যাই বলুক না কেন, মা-বাবার দৃঢ় বিশ্বাস ছেলে একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। বিন্দু পিসি রোজ মণীষাকে গাল মন্দ করে— "হতচ্ছাড়ি, দিলি তো আমার ছেলেটাকে বিদেয় করে। আমার বুকের ধনকে কোথায় হারিয়ে দিলি? আমার ঐ একটিমাত্র ছেলে... যবে থেকে মেয়ে এ ঘরে পা দিয়েছে, তবে থেকে ডাইনি একটার পর একটা অঘটন ঘটাচ্ছে রে...।" এইরূপ বলে, রোজ সকাল থেকে কান্না-কাটি, চেঁচামিচি শুরু করে বিন্দু পিসি। বিপ্লববাবু খুবই অসুস্থ, এখন সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন ; কথাবার্তা খুবই কম বলেন। বিশেষ করে, ছেলে চলে যাওয়ার পর থেকে বিপ্লববাবুর শরীর একদম ভেঙে পড়েছে, শোক পেয়ে চুপ হয়ে গেছেন তিনি। তবে, মণীষাকে নিজের মেয়ের মতো ভালবাসেন, খুবই স্নেহের চোখে দেখেন।

শাশুড়ীর গাল-মন্দ, পাড়া-প্রতিবেশীর গুজব, সব-ই মুখ বুজে সহ্য করে মণীষা। এ সব যেন তাকে পাথর বানিয়ে দিয়েছে। চুপ করে সারাদিন একভাবে কাজ করে যায় মণীষা। স্বামী চলে যাওয়ার পর সে ঠিক করেছিল যে বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবে। বাবা রাজী হলেও দাদারা কেউ রাখতে চায়নি। এখনও তার কেউ খবর নিতে আসেনা। তার সঙ্গে কথা-বার্তা শুধু গ্রামের দু-চারটি বউদের সঙ্গে হয়। তারাও তো কথার মাঝখানে মণীষার স্বামীর কথা তুলে, তার 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিতেপারলে বেশ সন্তুষ্ট হয়। মণীষার কাছে জীবন নীরস হয়ে পড়েছে, কোন কিছুই তার ভালো লাগেনা। শুধু ভালো লাগে সারা দিনের ওই একটি মুহূর্ত, যখন সে মঞ্জুসা নদীর কাঁচের মতো স্বচ্ছ জল ধরতে যায় কলসী নিয়ে ও সেই পোড়ো মন্দিরে পুজো দেয়। পোড়া মন্দিরটিতে ভয়েতে যেখানে কেউ যেতে সাহস করে না, তার

প্রতি-ই মণীষার এক অদ্ভুত টান। এতো সুন্দর গাছ-গাছালি, তার শীতল ছায়া, স্বচ্ছ নদী, নুড়ি পাথর বেষ্টিত জায়গা বোধ হয় মণীষা আর কখনও দেখেনি। কলসীতে জল ধরার পর, কলসীটিকে মন্দিরের একটা ধার করে রেখে সে পূজোর থালা নিয়ে মন্দিরের ভেতরে ঢোকে। পূজো দিয়ে থালাটি কলসীর কাছে রেখে সে নদীর এক ধারে পাথরের ওপর আধ ঘন্টা চুপ করে বসে থাকে। আর মনের যতো ক্ষোভ-দুঃখ সে প্রকৃতির সঙ্গে ভাগ করে, মনে মনে সে তাদের সঙ্গে কথা বলে। সেই সময়টুকু একজন বাউল গান গাইতে গাইতে মন্দিরের পাশে মাঠ দিয়ে যায়— "হায় রে বিধাতা একি তোর বিচার কি সুখ, কি দুখ মানুষেরে করলি একাকার।" গানটির কথা ও সুর মণীষার বড়ই ভালো লাগতো। তার জীবনের এক অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল গানটি। এগারো বছর ধরে মণীষা একলাই ছিল এই অপূর্ব মুহূর্তটুকুর ভাগীদার। তবে আজ ২-৩ বছর হলে, একজন ভিখারীও সেই সময়টুকুর ভাগীদার হয়েছে। সে সর্বক্ষণ মন্দিরের সামনে গাছ তলায় বসে থাকে। খালি গা শুধু একটা ছেঁড়া ধুতি পরে উবু হয়ে ঠায় বসে থাকে আর মণীষাকে একভাবে দেখে যায়। মণীষাও দু-একবার তাকিয়েছে তার দিকে— তাকানো মাত্রই ভিখারী মুখ নামিয়ে নিত। বড়ো আশ্চর্য লাগতো মণীষার, কোথায় যেন দেখেছে সে, সেই ভিখারীটিকে। কিন্তু ভিখারীকেই বা দেখে লোকে কতো মনে রাখে। এরকম রাস্তায় রাস্তায় কতো ঘোরে। পূজো সেরে ঘরে ফিরে মণীষা বেশ কয়েকবার এই নিয়ে ভেবেছে— "কোথায় দেখেছি ভিখারীকে? সেও বা আমায় অমন করে দেখে কেন?"

বেশ কিছু মাস যেতে মণীষা লক্ষ্য করল, ভিখারী অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আজকাল সে প্রায়-ই শুয়ে থাকে, মাঝে মাঝে একটা গোঁঙানি শব্দ আসে। একদিন ভিখারী 'জল জল' বলে কাতর স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। মণীষা সে সময় মন্দির থেকে সবে বেরিয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে কলসী নিয়ে ছুটে গিয়ে তার থেকে অল্প জল ভিখারীর মুখে দিল। কপালে হাত না ঠেকাতেও মণীষা বেশ বুঝতে পারলো যে ভিখারীর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। সে যেই না তার হাতটা ভিখারীর কপালে স্পর্শ করতে যাবে, ভিখারী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো "না না, এ অপরাধীর গায়ে হাত ঠেকিও না, এ অপরাধী এমন পবিত্র নারীর সেবার যোগ্য নয়।" এ কথা শুনে মণীষার গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। সে নিশ্চিত হলো যে, ভিখারী তাকে চেনে। তাই তা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে? আপনি আমায় চেনেন? আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।" ভিখারী আবার ঝিমিয়ে পড়লো, তাই মণীষা তাকে আর কথা না বলিয়ে কলসী, পূজোর থালা ও মনে হাজারটা প্রশ্ন নিয়ে, পেছনে ফিরে ভিখারীর দিকে তাকাতে তাকাতে সেখান থেকে চলে গেল। সেদিন মণীষা কাজে মন দিতে পারেনি, সারা রাত তার ঘুমও হয়নি ; তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে সর্বক্ষণ ভিখারীটি জড়িয়ে ছিল। কখন সকাল হবে, কখন-ই বা সে মন্দিরে পূজো দিতে যাবে, তবেই না আবার দেখা হবে সেই ভিখারীর সঙ্গে। তার পরিচয় পাওয়ার জন্য মণীষা উৎসুক হয়েছিল। পরদিন সকালে মণীষা একটু আগে থাকতেই মন্দিরের দিকে রওনা হয়েছিল ; সে যেন আর অপেক্ষা করতে পারছিল না।

সেখানে গিয়ে দেখে ভিখারীটি ঘুমোচ্ছে। তার জীর্ণ শরীর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। পূজো দিয়ে সবে মাত্র মণীষা পূজোর থালাটি মাটিতে রেখেছে, হঠাৎ— "মণীষা"! বলে কে যেন আর্তনাদ করে উঠলো। মণীষার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, সে চমকে উঠে পেছন ফিরে দেখে ভিখারী চোখ খুলেছে ; মনে হলো যেন সে-ই ডাকলো। মণীষা উত্তেজিত হয়ে ছুটে গেল ভিখারীর দিকে। ভিখারী দুটো হাত বাড়ালো। সে সোজা হয়ে বসতে চাইলে, মণীষা কোন মতে তাকে উঠিয়ে বসালো অর্ধেক শোওয়া, অর্ধেক বসা অবস্থায়। ভিখারীর খুব কষ্ট হচ্ছিল, তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সে খুব হাঁপাচ্ছে আর কুল্‌কুল্‌ করে ঘামছে। মণীষা তার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে আমায় সত্যি করে বলুন তো? আমার নাম-ই বা জানলেন কী করে? আপনি আমায় চেনেন...", ভিখারী তার কথাটা পুরোপুরি শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলো, "বেশী সময় নেই মণীষা। আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তুমি আমায় অনেক বছর আগে একবার দেখেছিলে, তোমার শুভ-দৃষ্টিতে...", মণীষা কাতর স্বরে বলে উঠলো "তবে, তবে কি আপনি আমার..."।

"হ্যাঁ, আমি তোমার স্বামী বিমল।"

"তবে এতবছর আপনি চুপ করে... আপনি, আপনি একটিবারও আমাকে জানতে দেননি... আমার, আমার মাথায় যে কিছু ঢুকছেনা, অমি কী করব?"

"আফশোষ করো না মণীষা, এ অপরাধীকে ঘরে নিয়ে যেতে পারতে না তুমি। কোন মুখে ঘরে ফিরতাম আমি? যে ছেলে তার মা-বাবার জীবনে জেনে শুনে দুঃখ ডেকে এনেছে, যে তার স্ত্রীর প্রতি এতো বড়ো অবিচার করেছে, তার, তার যে কোন অধিকার নেই (ছট্‌পট্ করতে করতে) সুখের জীবন-যাপন করার। তো... তোমায় আমি পরিচয় দেব বলে অনেক ভেবেছিলাম, কিন্তু (হাঁপাতে হাঁপাতে) সাহস হয়নি। আজ যখন আমার সময় হয়ে এসেছে, তখন তোমায় আর না বলে থাকতে পারলাম না।"

মণীষা কাঁদতে কাঁদতে বললো, "এ আপনি কী করলেন, এ আপনি কী করলেন, সারাটা জীবন এভাবে আমায় একা ফেলে রাখলেন? কি দুর্ভাগ্য আমার।"

বিমল আরও কষ্ট করে ঢোক গিলে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করল, "একটা কথা রাখবে মণীষা?"

মণীষা ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞাসা করল, "কী?" বিমল বললে, "মণীষা, একথা যেন কাউকে জানতে দিওনা যে তুমি তোমার স্বামীকে ফিরে পেয়েছিলে। মা বাবা যেন কোন মতেই জানতে না পারেন যে তাঁদের সন্তান মারা গেছে, আর তুমিও চিরজীবন সধবার বেশে থেকো ; মাথা থেকে কখনো সিঁদুর মুছোনা, তা না হলে কিন্তু আমার আত্মা শান্তি পাবে না। (মণীষার দুটো হাত ধরে), বলো মণীষা, এ প্রতিজ্ঞা রাখবে তো মণীষা, রাখবে তো? আর একটা কথা, মারা গেলে আমার মুখে তোমার ঐ কলসী থেকে জল দিও। দেবে তো মণীষা? বলো মণীষা, দেবে তো?"

মণীষা কিছু বলার আগেই, বিমলের মুখ থেকে রক্ত উঠলো, সে একবার হাত তুলে মণীষার মাথায় রাখলো, আর নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। মণীষা একটা আর্তনাদ করে উঠলো। সে চারিদিকে অন্ধকার দেখতে লাগলো— "এ আমার কী সর্বনাশ হলো গো", এ বলে সে মাটিতে একেবারে নেতিয়ে পড়ল। কোনো রকমে সে কলসীর কাছে পৌছলো, কলসীটিকে ঘসটাতে ঘসটাতে নিয়ে এসে, তা থেকে একটু জল সে তার মৃত স্বমীর মুখে ঢেলে দিল। তার শরীর অবশ হয়ে পড়ল, তার যেন আর ক্ষমতা নেই। সে সময় বাউল গান গাইতে গাইতে মাঠ দিয়ে চলেছে—

"হায় রে বিধাতা এ কি তোর বিচার
কি সুখ, কি দুঃখ মানুষেরে করলি একাকার।"

সেদিনের সেই ছোট্ট মুহূর্তটুকুর সাক্ষী, মণীষা ছাড়া ছিল, বটগাছ, মঞ্জুসা নদী ও পোড়ো মন্দিরের পাথরের বিধাতা যদি তিনি সত্যি বিরাজমান হন তো। গ্রামের আর কেউ জানতেই পারলো না সেই ঘন্টা দু'য়েকের এক প্রকান্ড ঝড়ের কথা।

স্বামীর মৃত দেহ ফেলে রেখে এসে, মণীষা খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোন রকমে বাড়ি ফিরল। সেদিন সে কোনো কাজ করতে পারেনি, সোজা গিয়ে খাটে শুয়ে পড়ল। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে। শাশুড়ী বললে, "মরণ! মেয়ের ঢং দেখো, সংসারের কাজ-কম্ম ফেলে রেখে খাটেতে চিৎপটাং। কেন মরতে এ ঘরে তোকে আমি নিয়ে এছিলুম।" শাশুড়ীর কথা মণীষার কানেও গেল না। এমন অসহায় অবস্থা, তাকে দেখাশুনা করারও কেউ নেই। দু'দিন যেতে না যেতেই মণীষাও মারা গেল।

পুত্রবধুর শ্রাদ্ধ কোনরকমে মিটিয়ে দিয়ে শাশুড়ী বললো, "যাক্ বাবা, এইবারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার বিমলটা ফিরে এলে, ওর একটা ভালো ঘরে বিয়ে দিয়ে দেবো।"

Mother

Nancy Sarker
2nd Year (Arts)

As I look into your eyes I see
An essence which is deep in me.
A sense of happiness
which is so hard to feel,
And all the time I know it is real.

As I feel your gentle touch, I sense,
That there need to be no more pretence,
For now I am in your love and light,
And you are holding me against you light.

As I breathe in your gentle fragrance,
I small,
A part of you which inside me dwells,
Sweet sandal wood, so clear and strong,
I smell the fragrance,
For which I have so longed.

Mother, stay with me through days and nights,
Heal my wounds and soothe my plight
And guide me to your divine light,
So that true happiness
Someday I may sight

Obliteration

Rudradip Gupta

One drop of water
Thousands screaming around,
Blast, oblivion
Again a drop of water.

If only I was granted a wish....

Soumava Bhattacharyaya
Isr Year (Science)

If only I was granted a wish,
I would fly to an island,
Where there would be no one,
but music and me.
I would dance to the tunes,
and go splashing into the water,
no one to disturb, nothing to worry about,
just eternity and me.

If only I was granted a wish,
I would go to heaven,
Far-far away from the deafening crowd.
I would dance with the angels,
and play hide-in-seek in the clouds.
I would be the king there,
with everyone offering me something or the other.
I would be so happy out there,
with no restrictions and with nothing to bother

If ony I was granted a wish,
I would love to make another,
only to make another.
But who's going to listen to my wishes;
nobody in this world seems to bother.
I wish I had a life fill of love and care,
where everyone needed me & gave me a lis listening ear.
Then perhaps I would not have wished for anything more.

Ulysses

Arindam Mazumdar
1sr Year (B. Sc.)

I discovered the warnth of your love,
Completing my epical explorations.
To search the nectar among far away lands.

I set to explore the earth, and the sky above.
I saw the tartareon flowers.
Their passionate colours fiercely glowing
and hypnotising fragrance flowing,
'Attracting befated voyagers,
Any mortal are overpowered.

The golden cities with glittering light.
Mirages of luxury in Utopia.
Skillfully hiding the necropolis;
Where the demons rule with might.
The promises kept and those broken'
Forlorn venturers left to mourn.
Lovers perishing in the fire of deceit.
Eternal epics all forgotten.

Ending my quest in distress, I return.
Trudging through the sea of tranquility.
Seeking your waiting embracing arms.
Building hopes with the rising Sun.

Drug Addiction

Chinmay Mallik
1sr Year (B. Sc.)

Is it a passion?
or fashion?
or emotion?

First day sweet, next day sweeter
Third day sweetest, gradually bitter.
The eyes remain the same
There is a change in view
The sun remains the same
But there seems to be a change in hue
It seems dusk even in dew
The old things seem so new

Like a wave insidious
Like a friend crafty
It leads one astray
And increases insobriety

Then it is not a passion beneficial
But becomes an evil essential
Which leads to pain, then to disease.
Then to decay, then to death.

It is like a butcher so cruel
With death an unconquerable duel
It is like to worship a devil
or to a tumour nurture
To invite the evil
To doom one's own future.

Jokes

Boss : Why did you lose your previous Jobs?
Candidate : I killed a Mosquito.
Boss : This could not have been the reason.
Candidate : Believe Me Sir, the Mosquito was sitting on the boss's head.

—Arun Kumar Tiwari (B. Sc.)

Food For Thought

Trishul Pani Mukherjee
(B.Sc.)

In a certion village there lives a barber.

He shaves only those who do not shave themselves. The question is : does the barber shave himself? Paradoxes like these have been around for quite some time.

According to another popular one, you are never supposed to reach your destination!

This is because when you have travelled half the distance, you have to cover the remaining half to reach your destination. After you have covered another half, you still have another half to cover. You could do this 'ad infinitum' and still not reach your destination. But we witness the violation of this obvious phenomenon in our daily life.

Does it not, therefore, prove that whatever we see is mere illusion and not the real thing?

We 'see' the past in the night sky! Surprised? well, what we see of the star is actually the state of the star in which it existed, thousands or perhaps, millions of years ago some of which might have become blackholes by now. Also, nothing happens in the universe without affecting the rest of it. For example, your cup of tea while cooling down, increases the entropy of the universe!

Consider this : When some positive numbers and their corresponding negatives (say 1, –1; 2 –2 etc) are written, in any order/arrangement, i.e, when taken cumulatively they do not exist even though they did exist individually.

Example : 1+3+5–2–3–1+2–5=0

It is, therefore, possible that all the objects present in the universe, when taken cumulatively, do not exit at all?

I restrict this apparently ridiculous article to the next and concluding item : the great Egyptian pyramids.

Thanks to Erich Von Daniken, question regarding our inconsistent past has been raised. The answer probably lies with the pyramids of Egypt.

The Egyptian pyramids are no doubt archaelogical marvels, but it is still not clear how they were built. With wood rollers and manpower available at that time, it would have taken at least 600 years to handle the $2^1/_2$ million stone blocks in the great pyramid of cheops are mind-boggling : (i) Height of the pyramid multiplied by 1,000 million corresponds to the distance between earth and sun.

ii) The meridian running through the pyramid divides continents and oceans into exactly two havles.

iii) Area of the base of the pyramid divided by twice it's height gives the celebrated figure r = 3.14159, discovered by Ludolf.

Such tremendously advanced mathematical calculations and other art forms from the land of Peru and also the Mayan Civilization suggests presence of life from outer spece during that period. Possible we are not alone in this Universe.

Those of you who call me a secptic after reading this article, I have for you Thomas Mann's words : 'The positive thing about the sceptic is that he considers everything possible!'

Agatha Cristie — The Legend

Bishwaksen Bandyopadhyay
1st year (B.A.)

The mere name Agatha Cristie brings forth respect in the minds of millions of people in the world. She was one of the greatest writers of all times. That she is popular is evident from the fact that only the Bible has been sold more times than her books.

Agatha Cristie created two immortal characters— Hercule Poirot and Jane Marple. Other than them Tommy and Tummence Beresford, Capt. Arthur Hastings, Chief Inspector Japp, Parper Pyen etc. have also become household names.

Agatha Cristie began writing at the end of the First World War. In her first book 'The Mysterious Affair at Style' she first introduces to the readers a retired Belgian detective— with an egg-shaped head and a passion for order — called Hercule Poirot. He is a man who abhors violence and uses his 'little grey cells' of the brain to solve mysteries. Hercule Poirat became one of the most renowned fuctional characters of all times in the world. His reputation is so high that perhaps only Sherlock Homes can come in the same classes as him. Almost all the Poirot books are astounding hits. Some of the most famous best-sellers are "The ABC Murders", "The Murder of Rager Ackroyd", "Five Little Pigs", "Evil Under the Sun", "Murder on the Orient Express" etc. Many of these have been filmed and great actors like Peter Ustinov, Albert Finney and Davd Suchet have played the role of the great detective.

Miso Jane Marple— an old lady who is inquisitive in nature and who is a great judge of character is another famous sleuth crested by Creatie. Miss Marple lives in a small house in a small village called St. Mary Mead and passes her time by gardening, knitting and listening to local gossip. In between them she also samehow manages to solve baffling crimes which have left the police clueless. "A Caribbean Mystery", "Nemesis", "The Mirror Crack'd from Side to side" etc are legendary stories featuring this old lady who is much like anybody's aunt fondly spoken of as a 'Rarmless old pussy'.

Mrs. Cristie's characters have appeared in films, radio programmes and stage plays through out the world. In fact, the world's longest playing play "The Mousetrap" was written by her. It is still playing today in a London theatre after about thirty years. Agatha Cristie wrote seventy-seven detective novles and books of stories. She also wrote six romantic novles under the pseudonym Mary Westmacott. She often assisted her archeologist husband Sri Max Mallowan in various expeditions to the middle-east is found in many of her stories.

Agatha Cristie's soties became world famous mainly due to the fact that she could create outstanding characters and place them in reveting situations which fulfils the hunger of the reader. The twists and turns found in her stories are sensational. The reader gets engulfed in a breathtaking aura of suspense, mystery and intrigue.

Mrs. Cristie received the "Dame of the British Empire" title and died in the year 1976.

"Role of Women in India"

Sourav Nandy
1st year (B.Sc.)

Traditionally Indian women enjoy liberty not only in household affairs but also in public life. In ancient Indian women are free to choose their husbands and participate in education, social and communal life is well recognised. Some versatile genius women composed hymns also. With the growth of rigidity in caste system, the position of women gradually degraded. In the middle ages women were sunk into colossal ignorance and negligence except a few exceptions like Sultana Rezia.

In the eighteenth century the women were bound by a cluster of social problems like Sati Incarnation, Purdah System, Child Marriage, Denial of Education, Infanticide etc. The pioneer of renaisance *Raja Ram Mohan Roy* endeavoured to change the lot of women folk. Other social reformers like *Vidyasagar, Dayananda Saraswati* etc. drastically changed the outlook of women by their attempts to introduce education and social refroms like abolition of child marriage, infanticide etc. This was the beginning of emancipation of superstitions Indian women.

In modern India women have gained equal status with in many spheres of social, religious and political life. The constitution of India guarntees equal pay for equal jobs and debars gender inequality.

Indian women inherit ancestral property. The achievments of Indian women in army, navy, airforce, engineering, fine arts, literature etc. are exemplary. 33% of seats in local Governments like panchyat, municipality, corporations are reserved in many states. Participations and reservations for women in assemblies and in parliament are hotly debated in contemporary Indian politics. The Supreme Court of India recently has given a verdict in which women are adjudged as the rightful gurdian of sibblings on equal footing of fathers and thus has heralded the abolition of patriarchial system.

Jokes

A man went to the eye specialist to get his eye tested and asked, "will I be able to read after wearing glasses?

Doctor : Yes, of course, why not?

"So nice it would be," said the patient with joy, 'I have been illiterate for so long.

—Arun Kumar Tiwari (B. Sc.)

Debate forum

Satabdi Samtani
2nd year (B.Sc.)

Astrology should not be in the college curriculum

In an age where a subcontinent boasts of having nuclear capabilities, teaching a subject like astrology is nothing but a mockery. Its proponents call it a 'science', as it is cousin of the widely acclaimed science 'Astronomy'.

Astrology however has its roots somewhere else-the very basic fact that the planets and the sun revolve round a static earth, is the first basic contradiction. The contradictions further aggravate with additional superstitions like the evil planet— Saturn, the planet for good luck and wealth— Jupiter etc which does not satisfy rational and sceptical Homo sapiens. The fear of the unknown, inquisitiveness, insecurity and escapism of man has led to the popularity of this 'predictive art'. The practitioners of this predictive art emphasize that a quantitative amount of predictions come true. But such a stand could rightly be countered in the words of nuclear scientist H. Narasimhan, "occasionally a prediction by an astrologer may come true. But even a clock, which is not working, will show the correct time twice a day."

The hard core opportunists call the introduction of this subject 'traditionalism' as it falls under the much popular banner of 'Hindu Heritage'. But beneath the heap of controversies there lies an unanswered query— in a situation where the UGC is cash starpped, the cost incurred by it in teaching this subject to twenty universities across the country would be rupees two crores. This comes as a contradition to UGC's earlier plea urging all colleges to become financially self-sufficient. Thus, such a huge grant for popularising Astrology has put the UGC into a legal trap.

To rightly conclude in the words of Professor Yash Pal, "let astrology remain a harmless pastime, study the sociology behind its popularity". In a crucial time when the eardication of irrationalism was an utmost priority, the inclusion of such a pseuo-science under the college curriculum would only be a step backwards.

The Exuberance of Inner Soul

Gaurav Roy
3rd year (B.Sc.)

Life is not just party and pleasure; it is also pain and despair. Unthinkable things happen. Sometimes everything becomes a *faus pas*. Bad things happen to good people. Some things are beyond control, such as physical disability and birth defects and many other things.

On a clear, tranquil day, hundreds of boats are sailing in all different directions in a lake. How come? Even though the wind is unidirectional. What is the difference? It depends on the way the sail is set, and that is determined by the sailor. The same is true of our lives. We can't choose the direction of the wind, but we can choose how we set the sail.

We can choose our attitude even though we cannot always choose our circumstances. The choice is either to act like a victor or a victim. It is not our position but our disposition that determines destiny. Whatever is destined to happen, will happen. Astrology, palmistry etc are all phoney concepts. The best way to deal with life is to remain pragmatic, vivacious and logical.

It takes both rain and sunshine to create a rainbow. Our lives are no different. There is happiness and sorrow. There is agony and ecstasy. There is the good and the bad; dark and bright spots. If we can handle adversity, it strengthens us at last we can say, that we cannot control all the events that happen in our lives but can control how we deal with them.

Attitude is eveything. Character should be suave and impeccable. Discipline, determination and dedication are the three pillar that make a complete person. Life is not a bed of roses. Ironically, life itself is the best teacher of this fact.

Jokes

Daughter : Mother, I studied till Midnight
Mother : Really? That's nice. What time did you start Studying?
Daughter : At 11.55 P.M.

Student : Sir, can a boy be punished for what he has not done.
Teacher : No, of course not.
Student : Well, I haven't done my homework.

—Arun Kumar Tiwari (B. Sc.)

New Horizon of Vaccines

Abhirup Mukhopadhyay

3rd year (B. Sc.)

Introduction : The spine-chilling epidemics of killer diseases of yester-years are today forgotten stories. The scourges of smallpox, polio and plague, to name a few, once went rampant upon our planet, taking a toll of human lives in millions. But, times have changed. Many infections diseases have been brought under control, thanks to several vaccines, which are known to offer protection against them. However, vaccines cannot protect us from all diseases. Microbes that cause deadly diseases like AIDS, malaria, leprosy, herpes and hepatitis C are still victorious in their vicious attempt to flourish unchecked in the body of a human host. Owing to the inherent limitations of the existing vaccines, search is now on for new and better vaccines — the DNA vaccines — that may offer a sure-shot solution to combat the hitherto untamed deadly pathogens.

Discovery : But how did the idea of employing genes directly to serve as vaccine took its root. It was way back in 1970's when scientists trying to deliver genes into cells for correcting genetic disorders observed that proteins coded by the inserted genes were sometimes destroyed in animals receiving the genes. The scientists pondered what such unwanted immune response could be good at? Various groups of scientists in the US answered this question independently, coming separately to the same conclusion — that a specific gene of a pathogen when inserted into rodents and primates could gear up their defense machinery to an extent that the animal could ward off an attack by that actual pathogen. So much experimental work on this subject has now taken place that today early-stage human trials of some DNA vaccines are already under way. One such DNA vaccine to combat the formidable AIDS virus is currently under clinical trials. DNA vaccines for many other disease for which clinical tests are on are influenza, hepatitis B, herpes, and even malaria.

Mechanism of vaccine : Exactly the DNA vaccines are made with, one or more genes of a pathogen that are isolated which encodes proteins acting as strong antigens. These genes are then incorporated into small rings of double-stranded DNA called 'plasmids', which are orginally derived from bacteria. The resultant 'recombinant' plasmids basically constitute the DNA vaccine.

Administration : A DNA vaccine can be administered by injecting the tailored plasmid into the muscle, thus putting genes directly into muscle cells. Alternatively, the vacine could be coated into gold particles and delivered into the human body by a gene gun, which propels the plasmids into skin cells and mucous membranes. Yet another way of delivering a DNA vaccine into human body is by using weakened strains of bacteria, such as Salmonella typhimurium (which causes typhoid), Shigella flexneri and Listeria monocytogenes. Weakened forms of these bacterial species do not cause disease but can help in carrying the genetically engineered plasmid to special cells of the immune system which instantly engulf them. The bacteria break down inside these cells and release the plasmid molecules. Once the DNA vaccine is delivered into human cells, the plasmids make their way into the cell's mucleus. The pathogen's genes carried by the plasmid then begin to encode their protein products. As these antigenic proteins are foreign to the human host, the defense machinery is alerted to raise a counter attack.

Simple Vaccines-vs-DNA Vaccines : Genetic vaccines are superior in performance as compared to the existing vaccines as it gears up the human defense machinery to combat an invader. A vaccine preparation could activate one or both the arms— knows as the cellular and humoral arms— of the body's immune system by alerting a brigade if white blood cells called the helper T-cells. The cellular arm of the immune system is spearheaded by cytotoxic T-cells, also called the killer cells, which simply destory the infected cells and the invaders present within them. On the other hand, the B-cells command the humoral arm of the immune system. These cells basically act on the pathogen's that are outside cells. They wage a war against them by secreting specific molecules called antibodies. Acting like missiles targeted against the invader, antibodies latch onto them firmly destroying them thereafter. Conventional vaccines, which consist of killed pathogens or those comprising the select antigens of a pathogen, cannot make their way into cells. Therefore, they elict only humoral response by which specific antibodies are produced to kill the pathogen. The cellular arm of the immune machinery does not get activated at all and the killer T-cells are not put into action. In other words, conventional vaccines do not generate a complete immune reponse and are ineffective against many pathogens that infiltrate into cells. Moreover, as these vaccines comprising killed pathogens or their select antigens are actually non-living preparations, their effect to trigger the immune system wears off after a time. Periodic booster shots of such vaccines are therefore necessary.

Vaccines comprising the weakened but live form of a pathogen, usually a virus, enter the host cells and activate both the arms of the immune system. Moreover, live vaccines mostly confer lifelong immuity. Nevertheless, live vaccines are not free of drawbacks. Since such vaccines comprise the weakened but live form of a pathogen, they have the potential to cause the full-blown disease in people whose immune system is highly compromised, like cancer patients, victime of AIDS and the very elderly. Worse, still, is the possibility of the weakened virus to revert to their virulent state where they become fully capable of causing the disease in normal people as well. So, there lies an inherent risk of reversion in all live vaccines.

Genetic vaccines offer the best compromise as they have selective benefits of the existing vaccines while posing no risk of infection. As the engineered plasmid of a DNA vaccine enters a cell, it activates both arms of the immune system. Moreover, there is no chance that a DNA vaccine would cause infection, as the engineered plasmid does not carry any genes needed for the replication of the pathogen. Making of a DNA vaccine is also simple, particularly with the advent of advances in generatic engineering and automated processes to synthesize DNA of a desired sequence. Since the DNA vaccine can offer protection against different strains of a pathogen, it will be highly effective against pathogens like the influenza virus, which are highly variable due to presence of several strains. Plasmids can be engineered to carry specific genes of different strains of such pathogens to make the DNA vaccine extremely effective. Genetic vaccines are also more stable than than the existing vaccines as DNA remains unaltered even under extreme conditions. Hence these vaccines remain potent for a long time when stored.

Significance : Useful immune responses have been achieved by many DNA vaccines tested in humans. No serious side effect of any DNA vaccine has been reported. However, many details on the effectiveness of these vaccines remain unanswered. These include finding ways to extend the survival of the engineered plasmid in the human body, finding the doses whichk are most effective and the kinds of delivery schedules which produce best results. Specific cells to which

DNA vaccines should be targeted for enhancing the celluar uptake of plasmids is yet another intriguing question that awaits an answer.

For making a still more effective DNA vaccine, scientists are incorporating into the antigen-carrying plasmids genes for signalling molecules called cytokines. These molecules are released by the cells of the immune system to regulate the activities of various cells involved in the defense machinery.

At present the exciting futuristic possibilities of genetic unmunization are indeed overwhelming. Scientists are busy mixing and matching different antigens of a particular pathogen with genes coding for cytokines and then incorporating them into plasmids for designing novel DNA vaccines. These vaccines are first tested in mice for the kind of immune responses they are able to generate.

Conclusion : In this way, designing, an effective DNA vaccine for a given pathogen is a hit and trial method, which aims at discovering the most useful mix of antigenic genes of a pathogen and genes for stimulating the immune responses oopens a vast range of new therapies for treating cancer and AIDS, in addition to giving a firm assurance that it is possible to tackle almost any kind of pathogen that invades the human body.

প্রুফ দেখার ত্রুটির জন্য প্রসুন কুমার ঝা-এর লেখা কবিতা "হম অর হমারা দেশ" বেশ কিছু ভুলসহ ৮নং পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে, এর জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী, আমরা নতুন করে সংশোধনসহ কবিতাটি ছাপিয়ে দিলাম।

— সম্পাদক মণ্ডলী

हम और हमारा देश

प्रसून चन्द्र झा

(विज्ञान)

क्यों वांटने की बात सोंचु देश को,
था कल तलक यह सभी के आँखो का तारा।
क्यों न सोंचे जोड़ने की बात हम,
वँटने से रोके क्यो न हम इसे दुवारा।
इस तरह लड़ते रहे यदि आपस में हम
कैसे बनेंगे एक दुजे का सहारा।
देख कर हमको हसेंगे विश्व वाले,
ताने कसेंगे देखकर लड़ना हमारा।
क्यों न हम मिलबैठ कर सारी समस्या हल करे,
फेंक दे बंदूक बम हाथियार सारा।
लगादें सारी शक्ति अपने देश के निर्माण में,
हो विश्व में कल देश अपना सबसे न्यारा।

'Martyr's Blood

Spirit of

Million Seeds'

First Martyr of Anti Globalisation

Movement

CARLO GIULIANI

Red Salute